KALIKATA LITTLE MAGAZINE LIBRARY-O-GABESHANA KENDRA
18/M TAMER LANE, KOLKATA-700009

Record No. : KLMLGK 2007/	Place of Publication : ৩ নং হেস্টিংস স্ট্রীট, কলকাতা
Collection : KLMLGK	Publisher : প্রমথ চৌধুরী
Title : সবুজপত্র (Sabuj Patra)	Size : 7.5" x 6"
Vol. & Number : 6/1 6/2 6/3 6/4 6/5	Year of Publication : বৈশাখ ১৩২৫ জ্যৈষ্ঠ ১৩২৫ আষাঢ় ১৩২৫ শ্রাবণ ১৩২৫ ভাদ্র ১৩২৫
	Condition : Brittle ✓ / Good
Editor : প্রমথ চৌধুরী	Remarks :

C.D. Roll No. : KLMLGK

সবুজ পত্র

সম্পাদক

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী

১৩২৬

বৈশাখ—আশ্বিন

বার্ষিক মূল্য—তিন টাকা ছয় আনা
'সবুজ পত্র' কার্য্যালয়, ৩ নং হেষ্টিংস্ ষ্ট্রীট,
কলিকাতা

কলিকাত',
৩ নং হেষ্টিংস্ ষ্ট্রীট
শ্রীপ্রমথ চৌধুরী এম্, এ, বার-য়্যাট ল কর্ত্তৃক
প্রকাশিত।

কলিকাতা
উইকলী নোট্স প্রিণ্টিং ওয়ার্ক্স,
৩ নং হেষ্টিংস্ ষ্ট্রীট
শ্রীসারদাপ্রসাদ দাস দ্বারা মুদ্রিত।

Kshitish Chandra Sen
Mymensingh

বর্ণানুক্রমিক সূচী।

(বৈশাখ—আশ্বিন)

১৩২৬

বিষয়। ... পৃষ্ঠা।

১। অতীতের বোঝা ... ওয়াজেদ আলি ... ৮১
২। আমাদের শিক্ষা ও বর্ত্তমান জীবন সমস্যা ... শ্রীপ্রমথ চৌধুরী ... ১৪৯
৩। ইঙ্গ-সবুজপত্র ... ... বীরবল ২১৮
৪। উড়ো চিঠি ... ... মৃতুঞ্জয় ৪১
৫। উন্মাদয়ন্তী জাতক ... শ্রীসুরেশানন্দ ভট্টাচার্য্য অনূদিত ২২১
৬। উপকথা (গল্প) ... শ্রীপ্রমথ চৌধুরী ... ৭৬
৭। একখানি পত্র ... ৺রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী ... ১৮২
৮। ওমর খৈয়াম ... ... শ্রীপ্রমথ চৌধুরী ... ৬৯
৯। কথিকা (গল্প) ... শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৮০, ১৯৩, ২৫৭
১০। কবি .... শ্রীকান্তিচন্দ্র ঘোষ ... ২৮৯
১১। খোলা চিঠি ... ... শ্রীপ্রমথ চৌধুরী ... ৭
১২। গান (কবিতা) ... শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ... ১
১৩। ঝিলে জঙ্গলে শীকার ... শ্রীমতী প্রিয়ম্বদা দেবী অনূদিত ১৩৫, ১৯৭, ৩৩৯
১৪। ঝুপ্ ঝুপ্—চুপ্! (গল্প) ... শ্রীসুরেশানন্দ ভট্টাচার্য্য ... ২২৭
১৫। ছু-ইয়ারকি ... ... শ্রীপ্রমথ চৌধুরী ... ১১০
১৬। দৃষ্টি (কবিতা) ... শ্রীহেমেন্দ্রলাল রায় ... ৩৩৮
১৭। নতুন রূপ কথা (গল্প) ... শ্রীসুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ... ৩০৯
১৮। নববর্ষ ... ... শ্রীপ্রমথ চৌধুরী ... ২২

১৯।	নবীনের প্রতি (কবিতা) ...	শ্রীসুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী	... ৩০৮
২০।	নেশার জের (গল্প) ...	শ্রীকান্তিচন্দ্র ঘোষ	... ৯৭
২১।	পত্র	শ্রীশিশিরকুমার সেন	... ২০৭
২২।	প্রতিধ্বনি (কবিতা) ...	শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা	... ৩৮
২৩।	প্রেম (কবিতা) ...	শ্রীকান্তিচন্দ্র ঘোষ	... ৩৯
২৪।	বিজ্ঞাপন রহস্য ...	বিরবল ...	... ~~২০৬~~
২৫।	বিরহাকাঙ্খা (কবিতা) ...	শ্রীকান্তিচন্দ্র ঘোষ	... ২৮৭
২৬।	বিসর্জ্জন (গল্প) ...	শ্রীবীরেশ্বর মজুমদার	... ৩৫৪
২৭।	ভাইবোন (গল্প) ...	শ্রীপ্রবোধ ঘোষ	... ২৫৩
২৮।	ভবভূতি (কবিতা) ...	শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা	... ৩৭
২৯।	ভারতের নারী ...	শ্রীবীরেন্দ্রকুমার দত্ত	.. ২৭১
৩০।	মহাদেব (কবিতা) ...	শ্রীসুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী	... ৩০৬
৩১।	মানুষ ও সমাজ ...	" " "	... ২৩২
৩২।	মিলনাকাঙ্ক্ষা (কবিতা) ...	শ্রীকান্তিচন্দ্র ঘোষ	... ২৮৬
৩৩।	মেয়ের বাপ (গল্প) ...	শ্রীপ্রবোধ ঘোষ	... ২৮০
৩৪।	মুক্তি (গল্প) ...	শ্রীকান্তিচন্দ্র ঘোষ	... ১৮৭
৩৫।	মুক্তির ইতিহাস (গল্প) ...	শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	... ৫৫
৩৬।	রবীন্দ্রনাথের পত্র ...	* * *	... ২
৩৭।	৺রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী ...	শ্রীঅতুলচন্দ্র গুপ্ত	... ৬০
৩৮।	রূপ (কবিতা) ...	শ্রীসুরেশানন্দ ভট্টাচার্য্য	... ৪০
৩৯।	সৎ-চিদ্-আনন্দ (কবিতা) ...	শ্রীমতী সরলা দেবী চৌধুরাণী	... ১৩৪
৪০।	সম্পাদকের নিবেদন ...	শ্রীপ্রমথ চৌধুরী	... ১২
৪১।	সাহিত্য চর্চ্চা	শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী	... ১০৩
৪২।	সোহাগ (কবিতা) ...	শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক	... ২৮৮

গান।

আমার জীর্ণ পাতা যাবার বেলায় বারে বারে
ডাক্ দিয়ে যায় নতুন পাতার দ্বারে দ্বারে ॥
তাই ত আমার এই জীবনের বনচ্ছায়ে
ফাগুন আসে ফিরে ফিরে দখিন বায়ে,
নতুন সুরে গান উড়ে যায় আকাশ পারে,
নতুন রঙে ফুল ফুটে তাই ভারে ভারে ॥

ওগো আমার নিত্যনূতন, দাঁড়াও হেসে,
চল্‌ব তোমার নিমন্ত্রণে নবীন বেশে।
দিনের শেষে নিব্‌ল যখন পথের আলো,
সাগরতীরে যাত্রা আমার যেই ফুরালো,
তোমার বাঁশি বাজে সাঁঝের অন্ধকারে,
শূন্যে আমার উঠ্‌ল তারা সারে সারে ॥

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

২৪ বৈশাখ, ১৩২৬

রবীন্দ্রনাথের পত্র।

ওঁ

শ্রীমান প্রমথনাথ চৌধুরী
কল্যাণীয়েষু

আমার শারীরিক অবসাদ এত বেশি হয়েচে যে, চিঠিপত্র লেখা প্রভৃতি সংসারের ছোট ছোট ঋণগুলোও প্রতিদিন জমে উঠ্‌চে—পরজন্মে এই পাপের যদি দণ্ড থাকে তাহলে নিশ্চয়ই আমি দৈনিক সংবাদপত্রের এডিটর হব। সে আশঙ্কার কথা মনে উদয় হলেই নির্ব্বাণমুক্তির জন্যে উঠে প'ড়ে লাগ্‌তে ইচ্ছা হয়—কিন্তু তার চেয়ে সহজ চিঠির জবাব দেওয়া। সবুজপত্রকে বাঁচিয়ে রাখ্‌তে হবে বই কি। দেশের তরুণদের মনে সবুজ রংকে বেশ পাকা করে দেবার পূর্ব্বে তোমার ত নিষ্কৃতি নেই—প্রবীনতার বর্ণহীন রসহীন চাঞ্চল্যহীন পবিত্র মরুভূমির মাঝে মাঝে অন্তত একটা আধটা এমন ওয়েসিস থাকা চাই যাকে সর্ব্বব্যাপী জ্যাঠামির মারী-হাওয়াতেও মেরে ফেলতে না পারে। অন্তহীন বালুকারাশির মধ্যে তোমার নিত্যমুখর সবুজপত্রের দোদুল্যমান ছায়াটুকু যৌবনের চির-উৎস ধারার পাশে অক্ষয় হয়ে থাক্। প্রাণের বৈচিত্র্য আপন বিদ্রোহের সবুজ জয়পতাকাটি শুভ্র একাকারত্বের বুকের মধ্যে গেড়ে দিয়ে অমর হয়ে দাঁড়াক। আমার এই খোলা জানালাটার কাছে বিশ্রাম শয্যায় শুয়ে আমি আমার

ঐ সাম্‌নের মাঠের দিকে অনেকটা সময় কাটাই। ওখানে দেখ্‌তে পাই মাঠের সমস্ত ঘাস শুকিয়ে পাণ্ডুবর্ণ হয়ে গেছে, শাস্ত্র-উপদেশে-ভরা অতি পুরাতন পুঁথির পাতার মত। অনেক দিন বৃষ্টি নেই রৌদ্রও প্রখর—তা'তে শুষ্কতা প্রবল হয়ে এক দিগন্ত থেকে আরেক দিগন্ত পর্য্যন্ত সমস্ত ভূমিকে অধিকার করেছে। তার প্রতাপ যে কত বড় তা এই দূরবিস্তৃত শূন্যতার একটানা বিস্তার দেখলেই বুঝতে পারা যায়। কিন্তু এরই মধ্যে একটিমাত্র তালগাছ এতবড় সনাতন নির্জ্জীবতাকে উপেক্ষা করে একলাই দাঁড়িয়ে আকাশের সঙ্গে আলোকের সঙ্গে নিত্যই আপনার পত্রব্যবহার চালাচ্চে। কোথাও কিছুমাত্র বাণী নেই কিন্তু ঐ একটু খানি মাত্র জায়গায় বাণীর উৎস কিছুতেই আর বন্ধ হয় না। একটি দেবশিশু প্রকাণ্ড দৈত্যের মুখের সাম্‌নে দাঁড়িয়ে হাসিমুখে যদি তুড়ি মারে তাহলে সে যেমন হয় এও তেমনি। যে অমর তার ত প্রকাণ্ড হবার দরকার করে না, মৃত্যুই আপনার আয়তনের প্রসার নিয়ে বড়াই করে। তোমাদের সবুজপত্র ঐ তালগাছটিরই মত দিগন্তবিস্তৃত বার্দ্ধক্যের মরুদরবারের মাঝখানে একলা দাঁড়াক্।

জরাসন্ধের দুর্গ ভয়ানক দুর্গ—সেখানে প্রকাণ্ড কারাগার, সেখানে লোহার শিকলের মালার আর অন্ত নেই। কিন্তু তার ভয়ঙ্কর কড়া পাহারার মধ্যেও পাণ্ডব এসে প্রবেশ করে, তার সৈন্য নেই সামন্ত নেই; সেই নিরস্ত্র তারুণ্য কত সহজে কত অল্প সময়ে জরাসন্ধকে ভূমিসাৎ করে দিয়ে তার কারাগারের দ্বার ভেঙে দেয়; সেখানে বন্দী ক্ষত্রিয়দের মুক্তিদান করে। আমাদের দেশেও জরাসন্ধের দুর্গের মধ্যে দেশের ক্ষত্রিয়েরাই বন্দী রয়েছে,

যারা ক্ষত থেকে দেশকে ত্রাণ করবে, যারা দূরে দূরান্তরে আপন অধিকার বিস্তার করবে, যারা বিরাট প্রাণের ক্ষেত্রে দেশের জয়ধ্বজা বহন করে নিয়ে যাবে, আমাদের অশ্বমেধের ঘোড়ার রক্ষক হবে তা'রা। সেই যুবক ক্ষত্রিয়দের হাত পা থেকে জরার লোহার বেড়ি ঘুচিয়ে দেবার ব্রত নিয়েচ তোমরা; তোমাদের সংখ্যা বেশি নয়, তোমাদের সমাদর কেউ করবে না, তোমাদের গাল দেবে, কিন্তু জয়ী হবে তোমরাই—জরার জয়, মৃত্যুর জয় কখনই হবে না।

তোমাদের সবুজপত্রের দরবারে আমাকে তোমরা আমন্ত্রণ করেচ। তোমাদের সাধনা যখন সবুজ পত্রের নাম নিয়ে আপনাকে প্রকাশ করে নি তখনো এই সাধনা আমি গ্রহণ করেছি, বহন করেছি। তারুণ্য নূতন নূতন কালে, নূতন নূতন রূপে, নূতন নূতন পুষ্প-পল্লবে নিজেকে বারবার প্রকাশ করে। প্রাণের অক্ষয় বট যে অক্ষয় তার কারণ তার মজ্জার মধ্যে চিরতারুণ্যের রসধারা বইচে। তাই প্রতি বসন্তেই সে বারেবারে নূতন বেশে নবযুবক হয়ে দেখা দেয়। আমাদের দেশেও জীর্ণ বটের মজ্জার মধ্যে যদি যৌবনের রস একেবারেই না থাকত তাহলে এর দ্বারাই দেশের চিতাকাষ্ঠই রচনা হত। কিন্তু এখানেও দেখি, মাঝে মাঝে যৌবন একটা আকস্মিক বিদ্রোহের মত কোথা হতে আবির্ভূত হয়ে কঠিন জরার প্রতি অশ্রদ্ধা প্রকাশ করে। আমাদের সময়েও সে নির্ভয়ে এসেছে, নূতন কথা বলেচে, মার খেয়েছে, পুরাতন আপন চণ্ডীমণ্ডপে বসে তাকে একঘরে করে দিয়েচে। সে দিন আমি সেই ঝোড়ো দলের মধ্যেই ছিলুম। দল যে বাহিরে খুব বড় ছিল তা নয়, কিন্তু অন্তরে তার বেগ ছিল। চণ্ডীমণ্ডপ নিবাসীরা এখনো সে জন্যে আমাকে ক্ষমা করে নি। আমি

তাদের ক্ষমার দাবীও করি নে, কেননা আমি জেনে শুনে ইচ্ছাপূর্ব্বক চণ্ডীমণ্ডপের শান্তি ভঙ্গ করেছি, সেখানকার বৈকালিক নিদ্রার যতদূর ব্যাঘাত করবার তা করতে ত্রুটি করি নি। অর্থাৎ বিকালের নিস্তব্ধ তন্দ্রালোকে সকালের চাঞ্চল্য সমীরিত করবার চেষ্টা করেচি।

আমাদের কালের সেই চাঞ্চল্য সাধনাই তোমাদের কালের নূতন পাতায় বিকশিত হয়ে নীলাকাশের উপুড়-পেয়ালা থেকে সূর্য্যালোকের তেজোরস পান করবার চেষ্টা করচে। সেই তেজ তোমাদের ফলে ফলে সঞ্চারিত ও সঞ্চিত হয়ে দেশের প্রাণ-ভাণ্ডারকে পুনঃ পুনঃ পূর্ণ করবে।

কিন্তু একটা কথা তোমরা ভুলে গেছ, ইতিমধ্যে আমার পদোন্নতি হয়েচে। ছিলেম যুবক মহারাজের দ্বারের প্রহরী এখন শিশু-মহারাজের সভায় সখার পদ পেয়েচি। অর্থাৎ নবজন্মের সীমানার কাছাকাছি এসে পৌঁচেছি—মৃত্যুর পূর্ব্বে এই চৌকাঠটি পেরোনোই বাকি আছে। এই যে এগোবার দিকে চলেচি এখন আমাকে পিছু ডাক ডেকো না। বিধাতা আমাকে বর দিয়েচেন আমি বুড়ো হয়ে মরব না। সেই জন্যে যৌবন-মধ্যাহ্ন পেরিয়ে আমার আয়ু চিরশ্যামল শিশু দিগন্তের দিকে নেমেচে। আমার জীবনের শেষ কাজ এবং শেষ আনন্দ ঐখানেই রেখে যাবার জন্যে আমার ডাক পড়েচে। যৌবনের জয়যাত্রায় আমার জীবনের অধিকাংশ কালই আমি আঘাত অপমান নিন্দার কাছে হার মানি নি, আমি অশান্তির অভিঘাতের ভয়ে পিঠ ফিরিয়ে পালিয়ে যাই নি। কিন্তু এখন দিন শেষে আমার মনিবের হাত থেকে পুরস্কার নেবার সময় হয়েচে। আমার মনিব এসেচেন শিশু হয়ে, পুরস্কারও পাচ্চি। তাঁর কাজে শান্তি অল্প, শান্তি যথেষ্ট,

কিন্তু ছুটি একটুও নেই। সেই জন্যে এখান থেকে আমি তোমাদের জয়কামনা করি, কিন্তু তোমাদের তালে তালে পা ফেলে তোমাদের অভিযানে চল্‌ব এখন আমার আর সে অবকাশ নেই। আগামী কালে যারা যুবক হবে আমি এখন তাদের সঙ্গ নিয়েচি। তাদের সেই ভাবী যৌবন নির্ম্মল হবে, নির্ভয় হবে, জড়তা, স্বার্থ বা জনাদরের প্রবলতা বা প্রলোভনে অভিভূত না হয়ে সত্যের জন্য আপনাকে উৎসর্গ করবে এই যে আমি কামনা করেচি সেই কামনা যদি আমার কিছু পরিমাণেও সিদ্ধ হয় তাহলেই আমার জীবন চরিতার্থ হবে। ইতি ১৭ বৈশাখ ১৩২৬।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

খোলা চিঠি।

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
শ্রীচরণেষু।

আপনার চিঠি ঠিক সেই সময়ে আমার হাতে এসেছে, যখন আমার অবসন্ন মনকে চাগিয়ে তোলবার জন্য, আপনার মুখের উৎসাহের বাণী আমার মনের পক্ষে একান্ত প্রয়োজন ছিল।

আপনি সম্ভবত লক্ষ্য করেছেন যে, আমি কিছুদিন থেকে আমার লেখার হাত ক্রমে গুটিয়ে নিচ্ছি। লেখবার প্রবৃত্তি সকলের পক্ষে অদম্য ত নয়ই—স্বাভাবিকও নয়। অতএব অবলীলাক্রমে লেখা সকলের সাধ্য নয়। আমাদের মত লেখকদের পক্ষে যা স্বাভাবিক সে হচ্ছে লেখবার অপ্রবৃত্তি, এবং এই আন্তরিক অপ্রবৃত্তির সঙ্গে যোঝাযুঝি করে' তার উপর জয়ী হওয়া যে কত কঠিন, কত আয়াসসাধ্য, তা লেখকমাত্রেরই অন্তর্যামী জানেন। তার উপর দুঃখের বিষয় এই যে, আর পাঁচ রকম হাতের কাজের মত, লেখার অভ্যাসটা কালক্রমে দ্বিতীয় স্বভাব হয়ে দাঁড়ায় না। একবার হাত তৈরি হয়ে গেলে, বাজনা লোকে অন্যমনস্ক হয়েও বাজাতে পারে, কিন্তু লেখা, মন না দিয়ে, শুধু হাত দিয়ে কেউই লিখতে পারে না, সম্ভবত এক সংবাদ পত্রের সম্পাদক ছাড়া।

আমি আজ পাঁচ বৎসর ধরে, আমার প্রকৃতির এই ধাতুগত অপ্রবৃত্তির সঙ্গে ক্রমাগত লড়াই করে আসছি, ফলে আমার অন্তরাত্মা বর্ত্তমানে, একসঙ্গে শ্রান্ত, ক্লান্ত, বিষণ্ণ ও অবসন্ন হয়ে পড়েছে। আমার দেহ ও মন, তাদের বিশ্রামের হাল-বকেয়া সমস্ত পাওনা, একযোগে সুদসুদ্ধ আদায় করে নেবার চেষ্টায় আছে। আলস্য যখন দেহকে এবং অবসাদ যখন মনকে একসঙ্গে পেয়ে বসে, তখন লেখক-মাত্রেরই পক্ষে, অন্তত কিছুদিনের জন্য সাহিত্যের কারখানা থেকে ছুটি নেওয়া দরকার। তাতে শুধু লেখকের নয়, সাহিত্যেরও উপকার হয়। কেননা মনের এ অবস্থায় আমাদের সকল লেখাপড়া একান্ত নিরর্থক, আদ্যোপান্ত বৃথা বলে মনে হয়।

"Of making many books there is no end and much study is a weariness to the flesh"—বাইবেলের সেই অতি পুরোণো কথা এ বিষয়ের শেষকথা বলে বিশ্বাস করতে সহজেই ইচ্ছা যায়।

আপনার চিঠি যখন আমার কাছে এসে পৌঁছয়, তখন আমি মনে মনে Vanity of vanities all is vanity—এই মন্ত্র জপ করছিলুম; কেননা এ মন্ত্র মনের সনাতন ঔষধ, হৃদয়ের সকল ক্ষতের অব্যর্থ মলম। এ সংসারে আমাদের কাছে যা সব চেয়ে প্রত্যক্ষ, সে হচ্ছে মানুষের লাঞ্ছনা—একদিকে প্রকৃতির হাতে, আর একদিকে মানুষের হাতে। মানুষ যেমন অশেষ দুঃখ নিজে পায়, তেমনি অশেষ দুঃখ পরকে দেয়। মানুষের এই দুঃখ আর এই পাপকেই যদি সার সত্য বলে স্বীকার করতে হয়, তাহলে ভেবে দেখুন ত, মনের অবস্থা কতটা আরামের হয়ে ওঠে। এ অবস্থায় "জীবন মিথ্যা

আর মৃত্যুই সত্য"—এই বিশ্বাস মানুষের মনে অপূর্ব্ব সান্ত্বনা এনে দেয়। জীবনের বিরাট ট্রাজেডিকে farce স্বরূপে দেখতে শিখলেই, আমরা যথার্থ মায়ামুক্ত হই। তবে মুস্কিল এই যে, এ সব কথা যত সহজে মুখে আনা যায়, তত সহজে মনে বসানো যায় না। দুনিয়াকে ফাঁকি বলে, আমরা কেউ আর নিজের দুঃখকে ফাঁকি দিতে পারি নে।

সে যাই হোক, একথা নিশ্চিত যে, এ রকম পীড়িত মনোভাব যে-কথার পিছনে আছে, সে কথা নিছক নৈরাশ্যের উক্তি হতে বাধ্য; সুতরাং সে কথার মূল্য বিকারের প্রলাপের চাইতে বড় বেশি নয়। তা ছাড়া মনের কৃষ্ণপক্ষ অপরকে দেখাবার মত বস্তুও নয়। নিজের মনের মেঘের ছায়া সমাজের মনের উপর ফেলবার কোনও সার্থকতাও নেই; বিশেষত এদেশে। এমনিই আমরা কর্ম্মসম্বন্ধে জ্ঞানসম্বন্ধে যথেষ্ট নিরুদ্যম যথেষ্ট নিশ্চেষ্ট। জীবনের উপর আমাদের শ্রদ্ধা নেই, শ্রদ্ধা ত দূরের কথা বিশ্বাস পর্য্যন্ত নেই, এবং তার কারণ আমাদের নিজের উপর নিজের ভক্তি নেই, আস্থা নেই। সুতরাং আমাদের জাতীয় মনের মজ্জাগত অবসাদকে প্রশ্রয় দেবার অধিকার আমাদের কারও নেই। "ততঃ কিম্" ভর্ত্তৃহরির এই প্রশ্ন সেই জাতিই করতে পারে, যে জাতি জীবনের সকল ক্ষেত্রেই নিজের কৃতিত্বের বলে জয়যুক্ত হয়েছে। এ প্রশ্ন আজকের দিনে জিজ্ঞাসা না করা ইউরোপের পক্ষে যেমন ছেলেমি, জিজ্ঞাসা করা আমাদের পক্ষে তেমনি অ্যাঠামি। মানসিক রক্তহীনতাকে আমি কখনই আধ্যাত্মিকতা বলে ভুল করিনি। আধ্যাত্মিকতা অর্থে আমি বুঝি আমাদের জীবাত্মাকে, আমাদের জ্ঞানের বলে কর্ম্মের বলে ভক্তির বলে শতদলে ফুটিয়ে তোলা, বুঁজিয়ে দেওয়া নয়; আমাদের প্রচ্ছন্ন আত্মশক্তিকে ব্যক্ত করে

তোলা, চেপে দেওয়া নয়। আত্মশক্তিকে অস্বীকার করাই ত মানুষের সকল দুর্গতির মূল। ভগবান মানুষকে একমাত্র ঐ শক্তিই দান করেছেন, ভগবানের দানকে অগ্রাহ্য করে, কেউ আর মানুষ হতে পারে না। অতএব ঔদাস্যের ও নৈরাশ্যের বাণী প্রচার করতে আমি কখনই ব্রতী হব না। "Vanity of vanities all is vanity" এ কথার বিরুদ্ধে আমাদের সকল মনপ্রাণ নিত্য প্রতিবাদ করে।

আর এক কথা। আমার বিশ্বাস দেশের লোককে আশার কথা, আনন্দের কথা শোনানই এ যুগের লেখকদের পক্ষে কর্ত্তব্য, নৈরাশ্যের কথা, ঔদাস্যের কথা নয়। আনন্দই হচ্ছে একমাত্র প্রকাশ করবার, দশদিক ছড়িয়ে দেবার, দশের মনে চারিয়ে দেবার বস্তু; অপর পক্ষে বেদনা দশের মন থেকে ছাড়িয়ে, দশদিক থেকে কুড়িয়ে নিজের অন্তরে সঞ্চিত ও ঘনীভূত করাই সকলের পক্ষে না হোক, অন্তত লেখকদের পক্ষে কর্ত্তব্য; কেননা যে পরের ব্যথার ব্যথী নয়, সে পরকে কখন আনন্দ দিতে পারে না। নব্য-আলঙ্কারিকদের আদি-গুরু আনন্দবর্দ্ধনাচার্য্য বলে গিয়েছেন যে, ক্রৌঞ্চমিথুন বধে বাল্মীকির মনের শোক যদি তাঁর মুখে শ্লোকের আকার ধারণ না করত, অর্থাৎ তিনি যদি নিজের অন্তরের বেদনা পরের আনন্দের সামগ্রী করে তুলতে না পারতেন, তাহলে তিনি মানব-সমাজে শাশ্বতী সমা প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারতেন না।

এর থেকে ধরে নিচ্ছি মানুষের দুঃখ দূর করবার শক্তি যখন আমাদের নেই, তখন নিজের অন্তরের বেদনা, অপরের আনন্দের সামগ্রী করে তোলাই সকলের জীবনের ব্রত হওয়া উচিত। কে বলতে পারে যে, কবির সৃষ্টি প্রকৃতির সৃষ্টির চাইতে কম সত্য। এ

ব্রত কিন্তু এদেশে উদ্‌যাপন করবার ক্ষমতা একমাত্র আপনারই আছে। সুতরাং আশা করি আপনার মুখ থেকে আমরা নিত্য নব আনন্দের বাণী শুনতে পাব।

আমরা চেষ্টাচরিত্তির করে বড়জোর আশার বাণী প্রচার করতে পারি, তার বেশি কিছু করতে পারি নে, কেননা আনন্দ সৃষ্টি করবার শক্তি ভগবান আমাদের দেন নি।—ইতি

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী।

২০ বৈশাখ, ১৩২৬

সম্পাদকের নিবেদন।

ছেলেবেলায় গল্প শুনেছি যে, জনৈক অতি কৌতূহলী এবং সেই সঙ্গে অতি কৌশলী লোক কোন এক রোগের সুযোগে মিছে করে নিজের মৃত্যু সংবাদ রটিয়ে দেন, তাঁর মৃত্যুতে আত্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধবদের মধ্যে "কে কাঁদে আর কে বলে যাকগে," বেঁচে থাকতেই সেটা জেনে যাবার জন্য।

দেশময় যখন "সবুজ পত্রে"র মৃত্যু সংবাদ ছড়িয়ে গিয়েছে তখন ও পত্রের আবার সক্ষাৎ পেলে, লোকের মনে সহজেই এ সন্দেহ হতে পারে যে আমি ঐরূপ কোনও মতলবে উক্তরূপ কৌশল অবলম্বন করেছি।

"সবুজ পত্র" বন্ধ করবার প্রস্তাবের ভিতর অবশ্য কোনরূপ চাপা উদ্দেশ্য ছিল না। আমি একজন সাহিত্যিক-পলিটিসিয়ান নই; সুতরাং আমার কথার ভিতর কোনরূপ গূঢ় মতলব থাকবার কথা নয়, কেন না তা থাকলে সে কথা সাহিত্য হয় না। আর আমি পারি না পারি সাহিত্যই রচনা করতে চেষ্টা করি। তবে সত্যের খাতিরে আমাকে স্বীকার করতে হচ্ছে যে "সবুজ পত্রে"র মৃত্যুর জনরবের প্রসাদে ও-পত্র সম্বন্ধে লোকমতের কিঞ্চিৎ আভাস পেয়েছি। উপরোক্ত মতলবী ব্যক্তি তাঁর চতুরতার ফলে কি জ্ঞান লাভ করেছিলেন, সে বিষয়ে ইতিহাস নীরব। সম্ভবত সে জ্ঞান তাঁর তেমন মুখরোচক হয় নি। এ

সত্য সকলে না জানলেও সকলের জানা উচিত যে আসলে ভুল ধারণার উপরেই সকলে সুখে জীবন ধারণ করে। সে যাইহোক "সবুজ-পত্রে"র মৃত্যুসংবাদে বাঙলার একদল লোক দুঃখ প্রকাশ করেছেন, এতেই আমি কৃতার্থ হয়েছি, বিশেষত যখন "ও বালাই গেছে বাঁচা গেছে" এমন কথা কোনও দৈনিক সাপ্তাহিক, কিম্বা মাসিক পত্রে অদ্যাবধি আমার দৃষ্টিগোচর হয় নি। "সবুজ পত্রে"র মতামতে যাঁরা সায় দিতে পারেন না, দেখতে পাচ্ছি, তাঁরাও এ কথা স্বীকার করতে মোটেই কুণ্ঠিত নন যে, ও-পত্রের একটা নিজস্ব চেহারা আছে, এবং সেই সঙ্গে তার প্রাণও আছে। কেন না যার প্রাণ নেই অর্থাৎ যা মৃত, তার আর অকাল মৃত্যু কি করে ঘটতে পারে।

(২)

যখন দেশের অন্তত জনকতক লেখকও চান যে "সবুজপত্র" "বেঁচে থাক্ চিরজীবি হয়ে," তখন যতদিন পারি ও-পত্রকে বাঁচিয়ে রাখবার ইচ্ছা হওয়াটা আমার পক্ষে নিতান্তই স্বাভাবিক। এই প্রবৃত্তি যে অতঃপর সংকল্পে পরিণত করতে বাধ্য হয়েছি, তার কারণ অনেকের মতে আপাতত ও-পত্রের প্রাণরক্ষা করা আমার পক্ষে কর্ত্তব্যও বটে।

কেন কর্ত্তব্য সে কথাটা একটি উদাহরণের সাহায্যে পরিষ্কার করবার চেষ্টা করা যাক। প্রায় পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে বিজয়ী জর্ম্মাণ সেনা যখন প্যারিস নগরীকে ঘিরে বসেন, তখন প্যারিসের আবালবৃদ্ধ-

বনিতা সকলে একবাক্যে বলে উঠেছিল, "il faut etre là"—অর্থাৎ "এখানে আমাদের থাকা চাই"। অথচ কেন যে থাকা চাই, সে কথা জিজ্ঞাসা করলে শতকরা নিরনব্বই জন তার কোনও উত্তর দিতে পারত না। কেননা তাদের দ্বারা প্যারিস রক্ষার কোনরূপ সাহায্য হবার কোনই সম্ভাবনা ছিল না। অথচ এক প্রাণীও প্যারিস ত্যাগ করলে না, এমন কি অতি নিরীহ স্থূলকায় মুদি-পশারীরাও নয়। কারণ এ বিষয়ে প্যারিসের কোনও নাগরিকের মনে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ ছিল না যে, "il faut etre là"—নাগরিক-দের পক্ষে স্বেচ্ছায় প্যারিসে অবরুদ্ধ হয়ে থাকাটা ফলের দিক থেকে দেখলে একটা মস্ত অকাজ কিন্তু আত্মার দিক থেকে দেখলে যে একটা বড় কাজ, সে কথা অস্বীকার করা চলে না। যখন একটা বড় গোছের দায় জাতির ঘাড়ে এসে পড়ে তখন নিজ নিজ শক্তি অনুসারে তার ভারবহন করবার অধিকার যে সকলেরই আছে, এই মহা সত্যের সন্ধান প্যারিসিয়ান মাত্রেই নিজ অন্তরে লাভ করেছিল, এর প্রমাণের জন্য তারা কোনও যুক্তিতর্কের অপেক্ষা রাখে নি।

আজকের দিনেও আমরাও একটা যুগসন্ধির মধ্যে এসে দাঁড়িয়েছি, সুতরাং যাঁদের স্বদেশের প্রতি স্বজাতির প্রতি মমতা আছে, তাঁদের প্রতিজনের পক্ষেই যে যেখানে আছেন, তাঁর পক্ষে সেইখানেই দাঁড়িয়ে থাকা কর্ত্তব্য, কেননা নানারকম ভীষণ সমস্যা আমাদের চারদিক থেকে একেবারে ঘিরে ফেলেছে। সংক্ষেপে "il faut etre là" যদিচ আমরা ঠিক জানিনে যে এইরূপ দাঁড়িয়ে থাকবার কোনও সার্থকতা আছে, কি নেই।

(৩)

বর্ত্তমান ভারতে যে সমস্যাটা সব চাইতে প্রত্যক্ষ, সে হচ্ছে আমাদের পলিটিকাল সমস্যা পলিটিকাল হিসাবে আমরা পৃথিবীর মধ্যে একটি সম্পূর্ণ নগণ্য জাত, এ হীনতা আমরা কেউ প্রসন্ন মনে গ্রাহ্য করে নিতে পারি নি। ফলে এই অসন্তোষ দিনের পর দিন মাসের পর মাস বছরের পর বছর শুধু বৃদ্ধিও প্রসার লাভ করে এসেছে। তার পর এই যুদ্ধের ফলে পূর্ব্বে যা ছিল অসন্তোষ তা এখন দাঁড়িয়েছে অশান্তিতে। এ অশান্তির ভোগ পৃথিবীর সকল দেশের রাজা প্রজাকে কিছুদিন ধরে কিছু না কিছু ভুগতেই হবে, তার জন্য কোন পক্ষেরই হা হুতাশ করবার প্রয়োজন নেই। এ অশান্তির মূলে আছে বিশ্বমানবের সেই মুক্তির আশা, সেই মুক্তির আকাঙ্ক্ষা, সেই মুক্তির প্রয়াস, এক কথায় মানুষের সেই আত্মজ্ঞান, যা এই যুদ্ধের ক্রোড়ে বৃদ্ধিলাভ করেছে। মানুষ তার মনশ্চক্ষে আজ যে সভ্যতার সাক্ষাৎ পেয়েছে, কাল হোক্ পরশু হোক্ মানব সমাজে সে সভ্যতার প্রতিষ্ঠা হবেই হবে, কেউ তা চিরদিনের জন্য ঠেকিয়ে রাখতে পারবে না। হতে পারে যে আমার এ বিশ্বাস ভুল। তাতে কিছু আসে যায় না, কেননা ভুল ধারণার উপরেই সকলে যে জীবন ধারণ করে, আমার এ মত ত আগে থাকতেই জানিয়ে রেখেছি।

এই নব আশায় আমাদের বুক বাঁধতে হবে, এবং এই নব-সভ্যতা গড়বার দায়িত্ব আর পাঁচজনের মত আমাদেরও ঘাড় পেতে নিতে হবে; এই কথাটা স্মরণ রেখো যে, এই মুক্তির পথে অশেষ বাধা, অসংখ্য বিঘ্ন আছে। কোন বিষয়ে বাধা পেলে হতাশ হয়ে পড়াটা

আমাদের জাতিগত স্বভাব, আমরা যদি সত্য সত্যই জীবনের সকল ক্ষেত্রেই নিজের পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াতে চাই, তাহলে আমাদের চিরাগত স্বভাবকে পদে পদে অতিক্রম করবার জন্য প্রস্তুত হতে হবে।

এ সত্য আমরা ভুলে গেলে চলবে না যে, মানুষ কোনও কাম্যবস্তু একমাত্র কামনার বলে লাভ করতে পারে না, যদি না তার পিছনে সাধনার বল থাকে,—আর সাধনার অর্থ হচ্ছে বাধা অতিক্রম করবার ইচ্ছা ও জ্ঞান শিক্ষা ও শক্তি। সিদ্ধিলাভের পক্ষে মানুষের বিবিধ বাধা আছে, এক বাইরের আর ভিতরের। এই বাইরের বাধা গুলিই বেশি করে আমাদের চোখে পড়ে, কেননা চর্ম্মচক্ষুর সম্পর্কই হচ্ছে বহির্জগতের সঙ্গে। অথচ এ কথা সম্পূর্ণ সত্য যে নিজের ভিতরকার বাধাই হচ্ছে মানুষের সব চাইতে বড় বাধা, এবং এই বাধা অতিক্রম করতে না পারলে মুক্তিলাভ করতে কেউ পারে না, কোন ব্যক্তিও নয় কোন জাতিও নয়। আমাদের নিজের প্রকৃতিই যে আসলে আমাদের দীন করে রাখে, এ সত্য সকলের নিকট প্রত্যক্ষ নয়, তারপর যাঁর কাছে প্রত্যক্ষ তাঁর কাছেও সে সত্য প্রিয় নয়। নিজের প্রকৃতির উপর জয়লাভ করা অত্যন্ত কঠিন, এ যুদ্ধে হৃদয়াবেগের সাহায্য পাওয়া যায় না, অপর পক্ষে বাহিরের বাধা দূর করতে যখন আমরা অগ্রসর হই, তখন রোষ ও ক্ষোভ আবেগ ও আক্রোশ প্রভৃতি মনোবৃত্তি আমাদের প্রবল সহায় হয়। এদের সহায়তায় অবশ্য আমরা সব সময়ে সিদ্ধির পথে অগ্রসর হতে পারি নে। এ জাতীয় মনোবৃত্তি মানুষকে উত্তেজিত করে কিন্তু তার পথ নির্দ্দেশ করতে পারে না, এরা যে জন্মান্ধ। সুতরাং আমরা

যদি জীবনে মুক্তপুরুষ হতে চাই তাহলে আমাদের মনকে মুক্ত করতে হবে, জ্ঞানকে আয়ত্ত করতে হবে। যে জাতি-গঠনের কথায় দেশ আজ মুখরিত, তার গোড়ার কথা এবং শেষ কথাও হচ্ছে স্বজাতীর মন গড়ে তোলা।

(৪)

বাইরের অবস্থার যে বদল দরকার এ কথা আমি অস্বীকার করি নে, কেননা আমি বাহ্যজ্ঞান শূন্য নই। প্রতিকূল অবস্থার ভিতর মানুষ হয়ে ওঠা যে কতদূর কঠিন সে বিষয়ে আমি সম্পূর্ণ সচেতন। ম্যালেরিয়ার ভিতর বাস করে' অনশনক্লিষ্ট লোকে কেবল মনের জোরে যে সুস্থ ও সবল হয়ে উঠতে পারে, মনের এতাদৃশ অলৌকিক শক্তির উপর আমার কোন প্রকার ভরসা নেই। বাইরের অবস্থা যত অনুকূল হবে, দেহ ও মনে আমরা মানুষ হয়ে ওঠবার যে তত সুযোগ পাব, এ ত প্রত্যক্ষ সত্য। সুতরাং যাঁরা রাজনীতির ক্ষেত্রে শিল্প-বাণিজ্যের ব্যাপারে আমাদের দুরবস্থা দূর করবার জন্য ব্রতী হয়েছেন, তাঁরা যে দেশের মহা উপকার সাধন করছেন সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। আমার শুধু বক্তব্য এই যে, কেবল মাত্র কল কারখানার সাহায্যে আমরা যথার্থ মুক্তিলাভ করতে পারব না; কল তা—সে বসনেরই হোক আর শাসনেরই হোক, মানুষ গড়তে পারে না, কেননা ঘটনা এই যে মানুষেই কল গড়ে। বাহিরের অবস্থা যতই অনুকূল হোক না কেন, সে অবস্থা মানুষকে তার মনুষ্যত্ব লাভের

সুযোগ দেয় মাত্র, তার বেশি কিছু করতে পারে না। সে সুযোগের সদ্ব্যবহার করা আর না করা, করতে পারা আর না পারা, নির্ভর করে তার মন আর চরিত্রের প্রবৃত্তি ও শক্তির উপর।

মানুষের মন যে তার দেহের চাইতে বড়, তার আত্মশক্তিই যে সব চাইতে বড় শক্তি, এ কথা যদি সত্য হয়, তাহলে স্বীকার করতেই হবে যে আমাদের যথার্থ কাম্যবস্তু হচ্ছে মনের স্বরাজ্য, এবং এই স্বরাজ্য লাভের প্রধান সহায় হচ্ছে সাহিত্য। বাঙালীর মন বাঙলা ভাষার ভিতর দিয়ে বাঙলা সাহিত্যের সঙ্গে সঙ্গে গড়ে উঠবে, এই বিশ্বাস এই আশাই হচ্ছে "সবুজ পত্রে"র আন্তরিক কথা। এ কথা শুনে অনেকে বলতে পারেন—"সবুজ-পত্র' ত কিছুই গড়ে না, শুধু অনেক জিনিষ ভাঙ্গে। এর উত্তর যে মনের দেশেও কারাগারের দেয়াল ভাঙ্গার নামই গড়া।

(৫)

পৃথিবীতে এমন লোক অনেক আছে, যারা যে কাজ করতে পারে তাকে ছোঁয় না, আর যে কাজ করতে পারে না তাতেই গিয়ে হাত লাগায়। এইরূপ অনধিকার চর্চ্চার ফলে মানুষের ঢের চেষ্টা বিফল হয়, ঢের কাজ বিগড়ে যায়। আশা করি এ রকম ভুল আমরা করে বসব না। ভারতবর্ষকে এ যুগে বাঙালী যা দিতে পারবে, এবং বিশেষ করে বাঙলাই তা দিতে পারবে,—সে হচ্ছে তার হাতের কাজ নয় মনের কাজ। স্বদেশকে আমাদের প্রধান দানই হবে সাহিত্যদান। এ দান যে কি আকার ধারণ করবে তার পরিচয় নেওয়া এবং সেই

সঙ্গে তার মূল্য নির্দ্ধারণ করাটাও আমাদের পক্ষে নিতান্ত আবশ্যক, নচেৎ পরের কথায় আমরা স্বধর্ম্ম ত্যাগ করতে উদ্যত হতে পারি, এবং তাতে আমাদের যথেষ্ট ক্ষতি ত হবেই এবং ভারতবর্ষের কোনও লাভ হবে না। বৈষ্ণবকুল ত্যাগ করলেই যে তাঁতিকুল লাভ করা যায় না, এ সত্য এদেশে ইতর সাধারণেও জানে। যাঁরা সাহিত্য চর্চ্চা করেন তাঁদের চিরদিনই কাজের লোকদের কাছ থেকে নানারূপ বাজে কথা শোনবার জন্য প্রস্তুত থাকা প্রয়োজন। এ সব কথায় অবশ্য কর্ণপাত করতে হবে কিন্তু মনোযোগ দেবার প্রয়োজন নেই।

(৬)

আমরা সকলেই এখন দেশের পূজায় রত হয়েছি। এ পূজায় কেউ বা দান করবেন বস্ত্র, কেউ বা অন্ন, কেউ বা সুবর্ণ কিন্তু আমরা দান করতে পারব শুধু ধূপ দীপ আর পুষ্প। এই তিন দানের মূল্য যে কি সে বিষয়ে, একটি প্রাচীন ইতিহাস এখানে কীর্ত্তন করি। পুরাকালে এই ভারতবর্ষে সুবর্ণ নামক জনৈক ঋষি সায়ম্ভুব মনুকে প্রশ্ন করেন যে ধূপ দীপ পুষ্পের দ্বারা পূজা করবার সার্থকতা কি। ভগবান মনু পুষ্পদানের এইরূপ গুণকীর্ত্তন করেন—

* * * "দেবগণ কুসুমগন্ধ দ্বারা তুষ্ট হন, যক্ষ ও রাক্ষসগণ কুসুম দর্শনে সন্তুষ্ট হন, নাগগণ সম্যকরূপে পুষ্প উপভোগ করিলে তুষ্টি লাভ করে, আর মানবগণ আঘ্রাণ দর্শন ও উপভোগ এই ত্রিবিধ উপায় দ্বারা সন্তুষ্ট হইয়া থাকে।"

সায়ম্ভুব মনুর এ কথা যে সম্পূর্ণ সত্য, রবীন্দ্রনাথ এ যুগে তা অক্ষরে অক্ষরে প্রমাণ করে দিয়েছেন। তিনি ভারতীর পায়ে যে

পুষ্পাঞ্জলি দিয়েছেন, তার আঘ্রাণে ও দর্শনে বিশ্বের লোক মোহিত হয়ে গিয়েছে এবং তা উপভোগ করবার জন্য দেব দানব যক্ষ রক্ষ সকলেই লালায়িত হয়ে উঠেছে। মনু আরও বলেন যে—

"কুসুমগণ দেবগণকে তৎক্ষণাৎ প্রসন্ন করে; তাঁহারা সংকল্প দিদ্ধ অতএব প্রীত হইয়া মানবগণের মনোরথ ইপ্সিত দ্বারা পরিবর্দ্ধিত করেন" * * *

এ অবশ্য মস্ত আশার কথা, তবে তা এযুগে কতদূর ফলবে, সে ভবিষ্যতে দেখা যাবে।

এ দান করবার সাধ্য অবশ্য আমাদের নেই, কেন না প্রতিভার স্পর্শ ব্যতীত কোন ভাষাতেই কাব্যের ফুল ফুটে ওঠে না। তারপর আসে ধূপদানের মাহাত্ম্যের কথা, এ ক্ষেত্রে সে বিষয়ে মনুর বচন উদ্ধৃত করা নিষ্প্রয়োজন। ধূপদান করাও আমাদের ক্ষমতার বহির্ভূত, আমরা বড়জোর কালেভদ্রে ধূনো দিতে পারি, কিন্তু সে শুধু মশা তাড়াবার জন্য।

এখন দীপদানের সুফল শুনুন—

"দীপজ্যোতি উর্দ্ধগ ও অন্ধকার বিনাশক। এই নিমিত্ত উর্দ্ধগতি দান করে, এ বিষয়ে এই নিশ্চয় আছে। দীপদান হেতু দেবগণ তেজস্বী প্রভাসম্পন্ন ও প্রকাশমান হইয়াছেন, এবং দীপদান না করিয়া রাক্ষসগণ তামসভাবে লাভ করিয়াছে, অতএব দীপদান করা বিধেয় হইয়াছে। মানব আলোকদান হেতু চক্ষুষ্মান ও প্রভাযুক্ত হয়, অতএব দীপদান করিয়া হিংসা করিবে না, এবং তাহা হরণ করিবে না ও নষ্ট করিবে না" * * *

আমরা "সবুজ পত্রে"র অন্তরে মনের প্রদীপ জ্বালিয়ে রাখতে চেষ্টা করব এবং স্বদেশকে যদি কিঞ্চিত-মাত্র আলোকদানে সমর্থ হই, তাহলেই আমরা কৃতার্থ হব, কারণ আমরা চাই যে সকলে চক্ষুষ্মান ও

প্রভাযুক্ত হন। যাঁরা আলোকে ভাল বাসেন না তাঁদের নিকট আমাদের এইমাত্র প্রার্থনা যে, আমরা যে দীপদান করতে যত্নবান হয়েছি সে দীপকে, "হিংসা করিবে না, তাহা হরণ করিবে না ও নষ্ট করিবে না"। বলা বাহুল্য অন্ধকারেই মানুষ ভয় পায়।

পূর্ব্বোক্ত ইতিহাস মহাভারতের অনুশাসন পর্ব্বের সপ্তনবতিতম অধ্যায় হতে অনূদিত, কিন্তু এ অনুবাদ আমার কৃত নয় বর্দ্ধমান রাজবাটীতে এর জন্ম; সুতরাং এর ভাষার জন্য আমি কিছুমাত্র দায়ী নই। ইতি

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী।

নব-বর্ষ।

—:※:—

শ্রীমান চিরকিশোর

কল্যাণীয়েষু—

নববর্ষ আর নবহর্ষ, এদেশে এ দুই বস্তু এক কবিতা ছাড়া আর কোথাও মেলে না। আর আমাদের জীবনটা আর যাই হোক কবিতা নয়, যদি কিছু হয় ত সে এক মহা হ য ব র ল। তাই নতুন বছর প্রতি বৎসর আমাদের শুধু নতুন করে জ্বালাতে আসে, কিন্তু তাতে বেশি কিছু যায় আসে না। অভ্যাসের গুণে ও-জ্বালা আমাদের গা-সওয়া হয়ে গেছে। কিন্তু এবার বৈশাখ একেবারে অগ্নিশর্ম্মা হয়ে দেখা দিয়েছেন। আকাশ এক সঙ্গে এমন লাল ও করাল হয়ে উঠেছে আর বাতাস এতটা উত্তপ্ত ও ক্ষিপ্ত হয়ে ছুটেছে যে, মনে হয় যেন কাছে-কোলে কোথাও আগুন লেগেছে। সকাল থেকে সন্ধ্যে উপর থেকে অবিরাম অগ্নিবৃষ্টি হচ্ছে, আর পশ্চিম থেকে একটানা একরোখা হাওয়া বইছে, যার স্পর্শে মুখ পুড়ে যায়, বুক পুড়ে যায়; আর দিনভর কানে আসছে তার হা হা হো হো শব্দ আর নাকে ঢুকছে তার চন্দনের নয়, গন্ধকের গন্ধ। এ আকাশ এ বাতাস আমাদের বাঙলা দেশের নয়, এমন কোনও পোড়া দেশের, যার উপর রুদ্রের রোষ-কষায়িত নেত্রের দৃষ্টি পড়েছে।

সিন্ধুদেশে একটি সহর আছে যার তুল্য গরম জায়গা, থারমমেটরের মতে ভূ-ভারতে আর নেই, যতদূর মনে পড়ছে, সে সহরটির নাম হচ্ছে শক্কর। শুনতে পাই সে দেশের অধিবাসীরা বলে যে, ভগবান যখন শক্কর তৈরি করেছেন তখন নরক সৃষ্টি করবার আর কি প্রয়োজন ছিল। নরকের এক প্রদেশের দান্তের চোখে-দেখা বর্ণনাটি নিম্নে উদ্ধৃত করে দিচ্ছি, তার থেকে দেখতে পাবে যে, শক্কর বাসীদের এ প্রশ্ন মোটেই অসঙ্গত নয়।

"E già venia su per le torbid' onde
un fracasso d´un suon pien di spavento,
per cui tremavano ambedue le sponde.

non atrimenti fatto che d´un vento
impetuoso per li avversi ardori,
che fier la selva senza alcun rattento;

li rami schianta, abbatte e porta fuori;
dinanzi polveroso va-superbo,
e fa fuggir le fiere, e li pastori"

অস্যার্থ—

"নদীর অপর-পার থেকে একলক্ষে তার ঘোলাজল ডিঙ্গিয়ে এমন একটি বিকট শব্দ আমাদের কানে এসে পৌছল, যা শুনে আমাদের মন আতঙ্কে ভরে উঠল, আর যার ধাক্কায় নদীর উভয়কূল থর থর করে কাঁপতে লাগল।

এ শব্দ সেই বাতাসের চীৎকারধ্বনি, যে বাতাস আগুনের তাড়নায় ছুটে পালিয়ে আসছে এবং সুমুখে গাছপালা যা-পড়ে তাকেই অবিরাম প্রহার করছে।

এই রুক্ষ-বায়ু গাছের সব ডালপালা ভেঙ্গে মাটির উপর ছড়িয়ে দিচ্ছে, আবার সে সব ঝেঁটিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। এ বাতাস সুমুখে ধূলোর মেঘ উড়িয়ে মহাদর্পে তেড়ে আসছে, আর কি পশু কি মানুষ সকলকেই মারের চোটে খেদিয়ে দিচ্ছে।"

এ বৎসর বৈশাখের রোষে আমরা দান্তের নরকের নবমচক্রে যে পড়ে গিয়েছি সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নেই। জানো কি পাপে মানুষের এ নরক বাস হয়?—দান্তে বলেন সনাতন ধর্ম্মে বিশ্বাস না করায়। আমরা যে এ অপরাধে অপরাধী সে জ্ঞান আমার ছিল না। তবে কথা হচ্ছে এই যে, পৃথিবীতে নানা রকমের orthodoxy আছে, সম্ভবত আমরা তার ভিতর কোন একটার প্রতি আস্থাহীন হয়ে পড়েছি। সেই পাপেই আমাদের এই শাস্তি।

আসলে সত্য কথা এই যে শুধু শঙ্কর কেন, ভগবান যখন ভারতবর্ষ তৈরি করেছিলেন, তখন আর নরক তৈরি করবার কি প্রয়োজন ছিল? আগুন এদেশে চিরকালই জ্বলেছে—তাই না বৌদ্ধধর্ম্মের সাধনার ধন হচ্ছে নির্ব্বান, আর সনাতন ধর্ম্মের কাম্য ও গম্যস্থান, স্বর্গ। আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা স্বর্গে যাবার জন্য তেমনি লালায়িত হতেন, যেমন আমরা হই, সিমলে দারজিলিং যাবার জন্যে এবং দুই-ই এক কারণে অর্থাৎ হাওয়া বদলাবার জন্যে। এর প্রমাণ তাঁদের সঞ্চিত পুণ্য ক্ষয় হলে তাঁরা স্বর্গ ছেড়ে আবার দেশে ফিরে আসতেন, যেমন আমাদের পুঁজি-পাটা খরচ হয়ে গেলে আমরা সিমলে দারজিলিং থেকে আবার দেশে নেমে পড়ি। আমার বিশ্বাস আমাদের কাব্যে দর্শনে পুঁথিতে পাঁজিতে যে "ভবসাগর" উত্তীর্ণ হওয়া জীবনের প্রধান কর্ত্তব্য বলে উল্লিখিত হয়েছে, সে ভবসাগর

হচ্ছে কালাপানী। এবার মরে আমরা কে না আবার বিলেতে জন্মাতে চাই!

দেখতে পাচ্ছ গরমে আমার মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছে নইলে এত বেফাঁস বকি! আসল কথা এই যে, নববর্ষ আমাদের প্রাণে নব হর্ষ না আনুক, আমাদের মনে নব-আশা এনে দেয়। বাইরে ঝড় বইলেও মানুষ তার অন্তরে "ন মুঞ্চতি আশা বায়ু" এ হচ্ছে শাস্ত্র বচন, তারপর ভাষাতেও বলে, "যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশ"। অতএব সকলে মিলে, আশা করা যাক যে এবার বর্ষশেষে আমাদের হর্ষের কারণ ঘটবে।

(২)

গরম দেশে বাস করার ভিতর সুখ না থাক স্বস্তি আছে। সে দেশে মানুষ জীবনের বেশির ভাগ সময় ঘুমিয়ে, আর বাদবাকী অংশটা ঝিমিয়ে কাটাতে পারে। শ্রীযুক্ত বাল গঙ্গাধর তিলক প্রমাণ করতে ব্যস্ত যে বেদ উত্তরমেরুতে রচিত হয়েছিল, এ কথা সত্য কি মিথ্যা শুধু তাঁরাই বলতে পারেন, যাঁদের প্রথমত বেদের এবং দ্বিতীয়ত উত্তর-মেরুর সঙ্গে ঘনিষ্ট পরিচয় আছে, আমার নেই, অতএব উক্ত মন্ত্র প্রথমে উত্তরমেরুতে কিম্বা দক্ষিনমেরুতে উচ্চারিত হয়েছিল সে কথা বলতে আমি অপারগ। তবে বেদ যে গ্রীষ্ম প্রধান দেশের বাণী নয়, তার প্রমাণ "মা দিবাং সাপ্সি" এই বৈদিক নিষেধ বাক্য। আজও দেখতে পাচ্ছি শীতপ্রধান দেশের সভ্যতার মূলকথা ঐ একই। ইউরোপের দেবতারা যে জাগ্রত এ কথা কে অস্বীকার করবে? সে কালের আর্য্যেরা এদেশে এসে আমাদের দিবানিদ্রা ভাঙাতে একবার চেষ্টা

করেছিলেন, তারপর জলবায়ুর গুণে তাঁরা নিজেরাই তন্দ্রাভিভূত হয়ে পড়লেন, এবং দিবানিদ্রার নাম যোগনিদ্রা দিয়ে বেদের অবিরোধে সেই নিদ্রাসুখ অনুভব করতে লাগলেন এবং সেইসঙ্গে নানারকম পারলৌকিক সুখস্বপ্ন দেখতে লাগলেন। তারপর ফাঁক পেয়ে আমরা বহুদিন ধরে দিব্যি আরামে ঘুম দিচ্ছিলুম, ইতিমধ্যে ইউরোপ থেকে আর এক দল আর্য্য এসে আমাদের সে নিদ্রা আবার ভঙ্গ করেছে। ইতিমধ্যে অবশ্য নানা দেশ থেকে নানা জাতি এসে আমাদের যথেষ্ট হয়রান পরিশান করেছে, কিন্তু "মা দিবাং সপ্সি"—এ হুকুম আমাদের উপর তারা কেউ জারি করে নি। মোগল-পাঠান আমাদের দেহ নিয়ে অনেক টানাটানি করেছে কিন্তু তারা আমাদের মনের উপর হস্তক্ষেপ করেনি, অর্থাৎ তারা আমাদের দিবানিদ্রার ব্যাঘাত জন্মায়নি। বলা লাহুল্য ঘুমোয় আসলে শরীর, মন শুধু শুয়ে পড়ে।

এই নব ইউরোপীয় সভ্যতাই আমাদের মনকে এমনি জাগিয়ে তুলেছে যে, সে মনে ওঠবার এবং ছোটবার প্রবৃত্তি এক রকম অদম্য হয়ে উঠেছে। অথচ আমরা উঠতে গেলেই আমাদের বাসগৃহের ছাদ আমাদের মাথায় চড় মারে আর ছুটতে গেলেই তার দেয়াল আমাদের বুকে ঘুঁষো মারে। আর অমনি আমরা বাঁ হাত মাথায় দিয়ে বসে পড়ে ডান হাত বুকে দিয়ে কান্না জুড়ে দিই। সে কান্নার সুর ললিত আর তার বুয়ো হচ্ছে এই যে, যে মাথার মত চরম মাথা আর যে বুকের মত নরম বুক পৃথিবীতে আর কোথায়ও নেই, ছিল না, এবং থাকতে পারে না, সেই মাথা ও সেই বুকে এত চোট লাগে। এই ব্যাপারটারই নাম হচ্ছে ভারতবর্ষের বর্ত্তমান অশান্তি। এ অশান্তির ফল ভালই হোক আর মন্দই হোক, এর জন্য দায়ী ইউরোপের সাদা মানুষ, ভারতবর্ষের

কালা আদমি নয়। প্রথমত ইংরাজি শিক্ষা ঠুকঠাক করে আমাদের শুধু জনকতকের মনের নিদ্রাভঙ্গ করেছিল, তারপরে এই যুদ্ধ একঘায়ে দেশশুদ্ধ লোকের মনের নিদ্রাভঙ্গ করেছে। আজকের দিনে দেশের লোক কি চায় তা তারা ঠিক না জানলেও, যা আছে তাতে তারা যে সন্তুষ্ট নয় এ ত চোখে আঙুল-দেওয়া সত্য। আমাদের এ অশান্তির পরিচয় পেয়ে যাঁরা অতিমাত্রায় বিচলিত হয়েছেন, তাঁরা বলেন, তোমরা যা চাও সে হচ্ছে আকাশের চাঁদ। তথাস্তু। কিন্তু চাঁদ চেয়ে তার পরিবর্ত্তে অর্দ্ধচন্দ্র পেলে মানুষের বুক ত জুড়িয়ে যায়ই না, উপরন্তু মাথা গরম হয়। দেশের কথা এইখানেই খতম করা যাক। ও-কথা বলতে গেলেই হা হুতাশ করতে হয় এবং আমার বিশ্বাস আমরা সাহিত্যে দীর্ঘ নিঃশ্বাসের যথেষ্ট অপব্যয় করেছি, এখন অন্তত কিছু দিনের জন্য, আমাদের পক্ষে প্রাণায়াম অভ্যাস করা কর্ত্তব্য,-মনের বলাধানের জন্য।

(৩)

দেশের অশান্তির কথা ছেড়ে দিয়ে এখন বিদেশের শান্তির কথা পাড়া যাক। এ বিষয়ের বিচার আমরা খুব দূর থেকে খুব একটা উঁচু জায়গায় বসে করতে পারব, অতএব এ ক্ষেত্রে আমাদের রায় যথেষ্ট উদার, যথেষ্ট নিরপেক্ষ হবে; বিশেষত সে রায়ের যখন কোনও ফয়সালা নেই। পরের সমস্যার সহজ মীমাংসা কে না করতে পারে? তা ছাড়া এ বিষয়ে মতামত দেবারও আমাদের সম্পূর্ণ অধিকার জন্মেছে। ভারতবর্ষ হচ্ছে League of Nations, একটি Original member অর্থাৎ এই যুদ্ধের ফলে আমাদের আর

কিছু লাভ হোক আর না হোক আমরা গাছে না উঠতেই এক কাঁধি নামাবার অধিকার পেয়েছি। "কিমাশ্চর্য্যমতঃপরম্!"

ইংরাজিতে একটি প্রবচন আছে যে, "মন্দের ভিতর থেকে ভাল বেরয়"। এই যুদ্ধটা যতই আসুরিক, যতই পাশবিক হোক না কেন, এর ভীষণ আর্ত্তনাদের ভিতর থেকে একটা আকাশ বাণী শোনা গিয়েছে। এর দিগন্তব্যাপী তোপের আওয়াজ ভেদ করে এই কথাটা বেরিয়ে এসেছিল যে, এ হচ্ছে প্রভুত্বের বিরুদ্ধে স্বাধীনতার যুদ্ধ। এই আকাশ বাণীতে আমিও বিশ্বাস করেছিলুম, কেননা এ হচ্ছে আশার বাণী। জানই ত মানুষে যাকে বিশ্বাস বলে সে শুধু আশারই বেনামদার, সুতরাং ইউরোপের শান্তি-বচনে বিশ্বাস স্থাপন করে' আমি নির্বুদ্ধিতার পরিচয় দিই নি, পরিচয় দিয়েছি শুধু এই সত্যের যে, আমিও মানুষ অর্থাৎ মূলত আশাজীবি।

তবে আমার প্রকৃতি হচ্ছে এই যে, আশাই বলো আর বিশ্বাসই বলো, যতক্ষণ না তা স্পষ্ট একটা আকার ধারণ করে, ততক্ষণ তা মনের ভিতর দিয়ে শুধু আনাগোনা করে, সেখানে আসন পায় না। এই সংহার-নাটকের যখন দম ফুরিয়ে আসবে তখন তা যে মিলনান্ত হবে আমার এ বিশ্বাস থাকলেও উপসংহারটা যে ঠিক কি রকম হবে, সে সম্বন্ধে আমার কোনও স্পষ্ট ধারণা ছিল না। অতঃপর উইল্‌সন সাহেবের কল্পিত সাঙ্গোপাঙ্গ শান্তির প্রস্তাব যখন মূর্ত্তিমান হয়ে বিশ্বমানবের চোখের সুমুখে খাড়া হল তখন মহা উৎফুল্ল হয়ে উঠলুম, কেননা শুধু যে ধরাছোঁয়ার মত একটা জিনিষ পেলুম তাই নয়, দেখা গেল তাঁর মনগড়া শান্তির চৌদ্দটি পদ আছে। বাঙলার জনৈক রসিক লেখক বলে গিয়েছেন যে, "রচনটা গদ্য কি পদ্য তা

চেনা যায় শুধু চোদ্দয়"। এই সূত্রের উপর নির্ভর করে, সহজেই বিশ্বাস করেছিলুম যে এই সংহার নাটকটি অতি বিজিগিচ্ছি গদ্য হলেও এর উপসংহার হবে পদ্য, শুধু পদ্য নয়, একেবারে চতুর্দ্দশপদী কবিতা, ইংরাজিতে যাকে বলে 'সনেট'। এতে মনে একটু অহঙ্কারও হলো এই ভেবে যে শেষটা জয় আমাদেরই হলো কেননা উইল্‌সন সাহেব আমাদেরই দলের লোক অর্থাৎ তিনি একাধারে অধ্যাপক ও সাহিত্যিক। ভাল কথা উইল্‌সন সাহেবের Essays পড়েছ? চমৎকার লেখা। যে হাত থেকে State নামক হাজার দুয়েক শুকনো পাতার গ্রন্থ বেরিয়েছে, সেই হাত থেকে যে অমন সব সরস প্রবন্ধ বেরতে পারে, এ ধারণা আমার ছিল না। মধ্যে থেকে একটি অবান্তর কথা বলে নিলুম, এই প্রমাণ করবার জন্য যে আইনের অধ্যাপক হলেও মানুষে অবসর মত রসালাপ করতে পারে। যাক ও সব কথা, এখন আবার শান্তির প্রসঙ্গে ফিরে আসা যাক। আমরা ত আশা করেছিলুম মস্ত কিন্তু ফলে দাঁড়াল কি?—

দেখা যাচ্ছে যে এই কুরুক্ষেত্রে জয়যুক্ত পঞ্চপাণ্ডবের হাঢ়গড়া সন্ধিপত্রে যা আছে, সে হচ্ছে শুধু দেনা পাওনার হিসেব নিকেশ, আর পৃথিবীর জমির ভাগ বাঁটোয়ারা, এক কথায়, শুধু জ্যামিতি আর পাটিগণিত। "আশার ছলনে ভুলি কি ফল লভিনু হায়"—কবিতার বদলে অঙ্ক! আমরা চেয়েছিলুম দেখতে সভ্যতার একটা নতুন প্রাণ চিত্র কিন্তু দেখতে পাচ্ছি শুধু পৃথিবীর একটি নতুন মানচিত্র।

(৪)

এই প্রস্তুত শান্তির গুণাগুণ তিনিই বুঝতে পারেন যিনি

আজীবন রেখা ও সংখ্যা নিয়ে কারবার করেছেন। কিন্তু পৃথিবীতে এমন লোক পাওয়া দুর্লভ যিনি একাধারে পাকা জরিপ-আমিন ও পাকা সুমোর-নবিশ, কেননা মানব সমাজে কেউ পারে মাপতে আর কেউ পারে গুণতে। মহামান্য কলিকাতা উচ্চ আদালতে একদল উকিল আছেন যারা নাকি ম্যাপ বোঝেন ভাল, আর উক্ত আদালতে একদল ব্যারিস্টার আছেন যাঁরা নাকি হিসেব বোঝেন ভাল। এ কথা আমি বিশ্বাস করি। মোটামুটি মানুষ ঐ দুই ধাতেরই হয়ে থাকে। লোকে বলে আমাদের দেশে পলিটিক্সের যে দু'-দল হয়েছে, তার কারণ এরা দু'দল দু'জাতের লোক, মডারেটরা বোঝে ভাল হিসেব, আর Extremists-রা নক্সা! আমি যে এ দু'দলের কোন দলেরই নই, তার কারণ আমার কলমের মুখ দিয়ে যা বেরয় তা রেখাও নয় সংখ্যাও নয়, ছেরেপ অক্ষর। সীমার জ্ঞান ও অর্থের জ্ঞান আমারও আছে, কিন্তু সে অন্য ক্ষেত্রে। তবে পৃথিবীতে থাকতে হলে, যোগ-বিয়োগ-গুণ-ভাগের সঙ্গে একটা মোটামুটি রকমের পরিচয় সকলেরই হয়, আমারও হয়েছে। সেই পরিচয়ের বলে আমি বলি, পৃথিবীর একটা নতুন নক্সা পাঁচজনে সহজেই তৈরি করতে পারে কিন্তু বিশ্বমানবকে সেই সঙ্গে পক্ষীকৃত করা তাদৃশ্য সহজ সাধ্য ব্যাপার নয়। মাটিকে আমরা যেমন ইচ্ছে ভাগ করতে পারি, মানুষের সঙ্গে মানুষের যোগ-বিয়োগ করা নিয়েই ত যত মুস্কিল। যুদ্ধ মাটি নিয়েই হয়, শান্তি কিন্তু মনুষ্যত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত।

প্রথমেই দেখনা কেন, পাঁচজনে মিলে যত সহজে পৃথিবীর কালী করেছেন তত সহজে তার নক্সা তৈরি করতে পারছেন না। গোল

বেধেছে তার রঙ দেওয়া নিয়ে। এ মানচিত্রে রেখার সঙ্গে বর্ণের মহা দ্বন্দ্ব বেধে গিয়েছে, বর্ণ কোথাও বা সীমারেখাকে অতিক্রম করতে চাচ্ছে কোথাও বা বিভক্ত হতে আপত্তি করছে। জর্ম্মাণী বলছে, এ সন্ধি ত আসলে বিচ্ছেদ। অপর পক্ষে ইতালি বলছে, এ সন্ধিতে ত সমাস হল না। এই দুই আপত্তিই উঠছে বর্ণের দিক থেকে। এ দুই আপত্তির এমন কোনও সদুত্তর নেই যা সকলে বিনা বাক্যব্যয়ে গ্রাহ্য করে নিতে বাধ্য, তার কারণ ইউরেপের এই নূতন ভাগ বাটোয়ারার গোড়ায় একটা গলদ আছে।

এই নূতন বন্দোবস্তের গোড়ার কথা হচ্ছে Self-determinations of Nations অথচ nation যে কাকে বলে সে বিষয়ে এই বন্দোবস্তকারীদের মনে কোনও স্পষ্ট ধারণা নেই। Nation-এর মূল কোথায়, জমিতে না জাতিতে? যারা একদেশে বাস করে তারা সকলে মিলে যদি একটি nation হয় তাহলে তাদের জমি ভাগ করে নিলে তাদের nationality রক্ষা হয় না। এই হচ্ছে জর্ম্মানীর কথা। অপর পক্ষে যারা এক জাতের লোক তারা সকলে মিলে যদি একটি nation হয় তাহলে বিদেশকে আত্মসাৎ না করলে তাদের nationality-ও পূর্ণাঙ্গ হয় না। এই হচ্ছে ইতালির কথা। Nation শব্দের এই দুটি বিরোধী অর্থের সমন্বয় করতে গিয়েই যত গোলযোগ উপস্থিত হয়েছে। আসল কথা ও-দুয়ের কোন অর্থই পরীক্ষায় টেঁকে না, কেননা এক চৌহদ্দির ভিতর যেমন নানা জাত বাস করে তেমনি এক জাতের লোক নানা দেশে বাস করে। তা ছাড়া ইউরোপের কোন প্রদেশই একদেশ নয়; কেননা তার প্রতি দেশের চৌহদ্দি ক্রমান্বয়ে বদলাচ্ছে; ইউরোপের কোন জাতিই একজাতি

নয় কেননা তার প্রতি জাতির শরীরে নানা জাতির রক্ত আছে। এক কথায় ইউরোপের সব বর্ণই সঙ্কীর্ণ বর্ণ এবং এ বর্ণের ধর্ম্ম হচ্ছে চারিয়ে যাওয়া, কতকগুলি সরল রেখার ভিতর তাকে আটক রাখবার যো নেই।

কাব্যে দর্শনে বিজ্ঞানে, nation শব্দের যে অর্থই হোক পলিটিক্‌সে ও-শব্দের অর্থ হচ্ছে সেই জনসমূহ যারা এক রাজ্যভুক্ত এবং যাদের ভিতর সর্ব্ব প্রধান বন্ধনসূত্র হচ্ছে চিরাগত একশাসন, একপালন। প্রতি nation নিজের মনে নিজের nationality-র ভিত্তি যাই ভাবুক, প্রতি nation অপর সকল nation-কে শুধু পলিটিকাল nation হিসাবেই মানে এবং তার সঙ্গে কারবার করে। রাজনীতির দরবারে এই হিসেবটাই সব চাইতে বড় হিসেব বলেই রেখার সঙ্গে শুধু বর্ণের নয় সংখ্যারও বিবাদ ঘটে। পলিটিক্‌সে লোকবলও একটা কম বল নয়, সুতরাং ইউরোপের এই নতুন বন্দোবস্তে যে nation-এর লোক সংখ্যা বাড়ছে সেই খুসি হচ্ছে আর যে nation এর কমছে সেই ব্যাজার হচ্ছে, অতএব এ কথা নির্ভয়ে বলা যায় যে, এ ভাগ বাটোয়ারা হচ্ছে ইউরোপের রাজশক্তির যোগ-বিয়োগ। উইলসন সাহেব আশা করেন যে ঐ মহাদেশের রাজশক্তির এই বিশ্লেষণ ও আশ্লেষণের ফলে পৃথিবীতে চিরশান্তি বিরাজ করবে। কিন্তু এ আশা ফলবতী হবে কি না, সে বিষয়ে তিনিই আমার মনে একটু খট্‌কা লাগিয়েছেন। মানুষ যে কত নির্ব্বোধ তার একটি উদাহরণ তাঁর New Freedom গ্রন্থেই পড়েছি। উইলসন সাহেব বলেন যে Newton যখন এই জড়-জগতের laws of motion আবিষ্কার করলেন, তখন ইউরোপ ধরে নিলে যে ঐ একই law রাজনীতিতে প্রযুজ্য, অমনি সে দেশের রাজমন্ত্রীরা

balance of power-এর সৃষ্টি করতে বসে গেলেন। এ balance টিকলে না, কেননা জড়জগৎ আর মনোজগৎ এক নিয়মের অধীন নয়। এখন জিজ্ঞাসা করি আজকের দিনে বড় বড় রাজমন্ত্রীরা সেই পুরোণো balance of power ছাড়া আর কি রচনা করতে বসেছেন? নূতনত্বের মধ্যে এইটুকু যে, এবার নাকি এ balance তার গড়নের হিকমতে মানবসমাজকে stable equilibriun দান করবে। মানবজীবন কিন্তু ঘড়ির পেণ্ডুলমের মত। ঘড়ির দম বন্ধ না হলে ওর দোল বন্ধ হয় না। অতএব এ পৃথিবীতে মানুষ যতদিন বেঁচে থাকবে ততদিন সে কোন একটা অবস্থায় স্থির থাকবে না। একমাত্র মৃত্যুই মানুষকে চিরশান্তি দিতে পারে। মহাভারতে দেখতে পাই স্বর্গারোহণ পর্ব্ব ও শান্তি পর্ব্বের মধ্যে আরও অনেকগুলি পর্ব্ব আছে। সুতরাং এই শান্তি পর্ব্বই যে ইউরোপের ইতিহাসের শেষ পর্ব্ব, এ কথা বিশ্বাস করা কঠিন।

(৫)

ইউরোপ মায় আমেরিকা সমগ্র পৃথিবী নয় এবং ইউরোপের বাইরেও মানুষ আছে সুতরাং দেখা যাক, তাদের কি ব্যবস্থা হল।

এই শান্তির দরবারে স্থির হয়ে গিয়েছে যে সমগ্র আফ্রিকা এবং বেশির ভাগ এসিয়ার সব জাতিই নাবালক। পলিটিকাল হিসেবে যারা স্বরাট নয় পূর্ব্বেই বলেছি ইউরোপের কোন Nation-ই তাদের সাবালক বলে স্বীকার করে না। তাই এই নাবালকদের জন্য সব উছি নিযুক্ত করা হয়েছে, এবং যতদিন তারা সাবালক না হয় ততদিন এই উছিরাই তাদের শাসন-সংরক্ষণ করবে। এ অতি উত্তম ব্যবস্থা।

তবে এই প্রশ্নটা মনে সহজেই উদয় হয়, এই নাবালকেরা কবে সাবালক হবে? নাবালকের উছি নিযুক্ত করা মাত্র যে তার নাবালকত্বের মেয়াদ বেড়ে যায় ইউরোপের সকল আইনের ত এই কানুন। তারপর শুনতে পাচ্ছি উক্ত উছিরা এই সব নাবালকদের শিক্ষার ভার হাতে নেবেন—তাদের মানুষ করে তোলবার জন্য। এ অবশ্য ভরসার কথা, তবে ভয়ের কথা এই যে, ইউরোপীয় মতে শিক্ষা-পদ্ধতির একটা মোটা কথা এই যে, "Spare the rod and spoil the child."

যাকগে ও সব পরের কথা। আমাদের অবস্থা যে ঠিক কি দাঁড়াল সেটা এখন ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। League of nations-এর হিসাবে আমরা হলুম সাবালক আর nation হিসেবে থাকলুম নাবালক। একসঙ্গে সাবালক ও নাবালক দেখতে পাচ্ছ পৃথিবীতে আমরা ছাড়া কেউ হতে পারে না, আমরাই হচ্ছি মানবসমাজে এক-মাত্র living contradiction, এবং সম্ভবত এই contradiction-টা আবহমান কাল living থাকবে।

এত লম্বা বক্তৃতা করবার উদ্দেশ্য এই প্রমাণ করা যে, পৃথিবীর ভাবনা ভেবে কোনও লাভ নেই। ও-বস্তুটা যখন গোল তখন ওকে চৌকোস করবার চেষ্টা বৃথা; বিশেষত তাদের পক্ষে যাদের হাতে হাতুড়ি নেই। তার চেয়ে Voltaire-এর উপদেশ শিরোধার্য্য করা ঢের ভাল। মানুষের কাছে তাঁর শেষ কথা এই—

"Cultivate your garden"—অতএব এসো তুমি আমি সাহিত্যের চর্চ্চা করি, কেন না আমরা ঐ সাহিত্যের চাষ ছাড়া আর কিছু করতে পারব না।

(৬)

আর এক কথা, কোমর বেঁধে সাহিত্যের চাষ করাও আমাদের পক্ষে কর্ত্তব্য। ভারতবাসীর মন গড়ে তোলবার দায় বর্ত্তমানে বিশেষ করে বাঙালীর ঘাড়েই পড়েছে, এবং সে দায় এড়াবার আমাদের অধিকার নেই, কেননা এ দায় আর কেউ বহন করতে পারবে না।

এ যুগে সমগ্র ভারতবর্ষকে আমরা একটি বিরাট পুরুষরূপে দেখতে শিখেছি, ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশগুলি যার শুধু অঙ্গ প্রত্যঙ্গ মাত্র। কোন্ প্রদেশ তার কোন্ অঙ্গ তাও একরকম ঠিক হয়ে গিয়েছে। পাঞ্জাব যে এই বিরাট পুরুষের বাহু আর বোম্বাই যে তার উদর এ বিষয়ে দেশশুদ্ধ লোক এক মত। পূর্ব্বে আমরা দাবী করতুম যে বাঙলাই হচ্ছে বর্ত্তমান ভারতের হৃদয়, অতএব মাদ্রাজ তার পদ। মাদ্রাজ অবশ্য এতে আপত্তি করত এবং সে আপত্তি হালে হোমরুল দলে গ্রাহ্য হয়েছে। এই দলের পলিটিসিয়ানদের মতে, ভারতবর্ষের হৃদয় এখন তার বাঁ-দিক থেকে বদলি হয়ে ডানদিকে, এক কথায় বাঙলা থেকে সরে গিয়ে মাদ্রাজে স্থিতিলাভ করেছে। এ কথার প্রতিবাদ করবার আমাদের প্রয়োজন নেই, কেননা আমাদের কাছ থেকে ভারতবর্ষের হৃদয় কেড়ে নিলেও তার পা আমাদের ঘাড়ে অদ্যাবধি কেউ চাপিয়ে দেয় নি। কেন দেয় নি, তার ভিতর একটু রহস্য আছে। আমাদের নব-পেট্রিয়টরা ইতিমধ্যে আবিষ্কার করেছেন যে, এ বিরাট পুরুষের পা বলে কোন অঙ্গই নেই, এ যে চলে না, এই হচ্ছে এর বিশেষত্ব ও মহত্ব। এ কথা আমরা সকলেই মানতে বাধ্য, কেননা

জনরব যে এই নব-পেট্রিয়টরাই হচ্ছেন দেশের আগামী শাসনকর্ত্তা। তাহলেই দেখা যাচ্ছে যে বাকী থাকল শুধু একটি অঙ্গ—মস্তক। তাই আজ আমরা দাবী করতে পারি যে, বাঙলাই হচ্ছে ভারতবর্ষের মস্তক, আমাদের এই দাবীর বিরুদ্ধে কারও কিছু বলবার নেই, কেননা ও-অঙ্গের ভার নিজস্কন্ধে নিতে আমরা ছাড়া আর কেউ রাজি হবে না। ওর অন্তরে মস্তিস্ক নামক যে পারার মত পদার্থটি আছে তা মানুষের মনকে শেখায়-পড়ায়, তার বাহুকে শাসন করে, তার উদরকে অতি মাত্রায় স্ফীত হতে দেয় না, তার হৃদয়ের রক্তকে পরিষ্কার করে, তার পরে তা এমন সব ন্যায়ের বিধান দেয় যা মেনে চলা রক্তমাংসের শরীরের পক্ষে বড়ই কষ্টকর। এ ছাড়া ঐ মস্তিষ্ক নামক পদার্থটি "আইডিয়া" নামক এক অবস্তুর সৃষ্টি করে যাকে অন্তরে স্থান দিয়ে মানুষের সোয়াস্তি থাকে না, অথচ যার কাছ থেকে একদম পালানও মানুষের পক্ষে একেবারে অসম্ভব। এ অবস্তুর চর্চ্চা কাজের লোকেরা একেবারেই করতে নারাজ; অতএব এর চর্চ্চা এ যুগে আমাদেরই করতে হবে, কেননা আমরা যে জাতকে-জাত যে unpractical, এ সত্য ত সর্ব্বলোক-বিদিত। এই খানেই মনে করিয়ে দিই যে মানুষে যাকে সাহিত্য বলে—তার জন্মস্থান হচ্ছে ঐ মস্তিষ্ক। সুতরাং আমরা যখন প্র্যাকটিকাল নই তখন আমাদের পক্ষে একমনে সাহিত্য রচনা করাই শ্রেয়, বিশেষত যখন আমরা না করলে ও-কাজ ভারতবর্ষে আর কেউ করবে না। ভাববার চিন্তোবার আর কারও সময় নেই তারা সব বড় কাজে ব্যস্ত।

বীরবল।

ভবভূতি।

—:০:—

কি মেঘ গম্ভীর শ্লোক উঠিলে উচ্চারি,
নির্ভয় প্রবল কণ্ঠে কি মহা ঝঙ্কার!
সহস্র বর্ষেরো পরে প্রতিধ্বনি তারি,
আছে ভরি ভারতের প্রান্তর কান্তার।
তবু কি করুণ গীতি, তবু কি মধুর!
ক্রন্দনে লুটায়ে পড় এমন কাতর!
বীরের বিরহ-গাথা অপরূপ সুর;
কুসুম-কোমল তুমি হে বজ্র-কঠোর!
এত প্রেম কে শিখালে তরুণ ব্রাহ্মণ?
এত গর্ব্ব? তবু তুমি কর নাই ভুল;
শোভিল তোমারি ভালে বিজয়-চন্দন;
—কাল নিরবধি আর পৃথিবী বিপুল।
আজি যে সহস্র কণ্ঠে উঠে তব স্তুতি
হে কঠিনে সুকুমার কবি ভবভূতি!

৪ঠা মাঘ ১৩২৫।

শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা।

প্রতিধ্বনি।

—:০:—

প্রতিধ্বনি, প্রতিধ্বনি, চারিদিকে শুধু
প্রতিধ্বনি। কে আছ নির্ভীক বীর হেথা ?
এই বদ্ধ, অন্ধ কারাগৃহ ভাঙ্গি, বঁধু,
ধ্বনিরাজ্যে নিয়ে যাও ; দূর কর ব্যথা।
যুগযুগান্তর পূর্ব্বে কোন্ কথা কবে
উচ্চারিত হ'য়েছিল প্রতিশব্দ তার
প্রাচীর প্রহত হ'য়ে, বার বার, বার,
ফিরে আসে দ্বিগুণিত ত্রিগুণিত রবে।
যদি এর আবেষ্টনী ভেঙে ফেলা যেত !
আকাশের তলে শব্দ যদি প্রাণ পেত !
কি আনন্দে মাতিয়া উঠিত দশদিক,
মানুষ কি চোখে ধরা দেখিত চাহিয়া,
জীবন কি গান জানি, উঠিত গাহিয়া !
ধ্বনিরাজ্যে নিয়ে যাবে কে মোরে, নির্ভীক ?

২২শে মাঘ ১৩২৫।

শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা।

প্রেম।

—:০:—

দার্শনিক-বিজ্ঞ কহে—তারে বল প্রেম ?
অবিদ্যার মোহ সেতো মানব অন্তরে।
বিদেশী পিত্তল সেও স্বর্ণরূপ ধরে,
তারে বল আর কিছু—সে তো নহে হেম।

বৈজ্ঞানিক হেসে কহে—সৃজনের ধারে
বৃত্তি এক-প'ড়ে আছে প্রকৃতিরচন,
অভাবে স্বভাব সৃষ্টি—জনমে জীবন
যৌন-নির্ব্বাচন বৃত্তি—প্রেম বল তারে ?

কবি কহে—পণ্ডিতের বন্ধ্যাহিয়া মাঝে
প্রেমের জনম কভু সম্ভবে না সাজে !

সেতো কভু দেখে নাই রাধিকার সনে
কুঞ্জে বসি—সারা বিশ্ব শুধু শ্যামময়,
বাঁশীটি বাজেনি যার হৃদি-বৃন্দাবনে
সে কভু বুঝিতে পারে—প্রেম কারে কয় !

শ্রীকান্তিচন্দ্র ঘোষ।

রূপ।

—:*:—

নিয়ে নিমেষের প্রাণ
হাসিয়া পলক,
ফুলের এলান বুকে উষার আলোকে খুলিয়া ঝলক,
কোথায় মিলায়!
কাটে,—সে পরশটুকু ভাবিয়া ফুলের, আকুল দিবস
তার অজানায়!
মিলাইয়া গিয়াছে নিমেষে,
তাই সে—অমিয়-গলা শিশিরের কণা;
কুসুমের সকল জীবন
ঘিরিয়া থাকিত যদি হ'ত সে—বেদনা।

এলে তুমি যৌবনের
শ্রাবণ উষায়,
ঢালিয়া হৃদয় মনে অযুত সাধনে আকাঙ্খা আশায়
যে রূপ-প্লাবন,
প্রাণের গোপনে সে যে ঘুমায়ে পড়েছে, তারি স্বপনেতে
বিভোর জীবন!
রূপ সে যে বাঁশরীর সুর,
কাঁপিয়া কাঁপিয়া দূরে উড়ে চলে যায়;
স্তব্ধতার নিবিড় অন্তর
পরশে শিহরি দিয়া নিভৃতে ঘুমায়।

শ্রীসুরেশানন্দ ভট্টাচার্য্য।

উড়ো-চিঠি।

—:*:—

এপ্রিল ২২, ১৯১৯।

জীবনকুমার

তোমার উপরে আমি যে মনে মনে একটু বিরক্ত ছিলুম সেটা তোমার কাছে আজ আমার স্বীকার করতে দ্বিধা নেই, কেননা তোমার শেষ চিঠি পড়ে' একেবারে ডবল খুসি হয়েছি। তুমি হয়ত মনে মনে ভাববে যে, সে চিঠিখানার মধ্যে এমন কি অপরকে খুসি করবার মত পরমাশ্চর্য্য খবর ছিল! তা যে-খবর ছিল সেটা হচ্ছে এই যে, তুমি একটা কিছু করবে বলে' মনস্থ করেছ।

আমার দ্বিতীয় দফা খুসি হবার কারণ হচ্ছে এই যে, তুমি সাহিত্য-সেবায় জীবন উৎসর্গ করতে মনস্থ করেছ। আমার বিশ্বাস যে, "Pen is mightier than the sword," এ-কথাটা একটুকু অতি-রঞ্জিতও নয়, অতি-মণ্ডিতও নয়। লেখনী অসির চাইতে mightier ত বটেই, সেই সঙ্গে সঙ্গে তা subtler-ও। ব্রাহ্মণের স্থান যে ক্ষত্রিয়ের চাইতে উঁচুতে ধরা হয়েছে সেটা খামখেয়ালেও নয়, বা খোসখেয়ালীতেও নয়। অসি দান করে—মৃত্যু, আর লেখনী—অমৃত। অসি জীবন নিতেই পারে—লেখনী জীবন দিতেও পারে। তাই ত এ দেশে আজ লেখনীর এত প্রয়োজন, অবশ্য যদি সেই লেখনীর পিছনে এমন একটা মস্তিষ্ক থাকে যে-

মস্তিষ্কের চিন্তাশীলতা অধর্ম্ম নয় অকর্ম্মও নয়। তবে তুমি সাহিত্য-মন্দিরের পূজারি হয়ে কেবলই পুরোনো মন্ত্র আওড়াবে, না নিজে উদ্যোগ করে' সেই সঙ্গে সঙ্গে একটু ধ্যান ধারণাও করবে তা শুধু তোমার উপরেই নির্ভর করে। তবে তোমাকে এইখানে এই কথাটা বলে' রাখছি যে, মন্ত্রের যে গুণ তা মানুষের জিহ্বা দন্ত ওষ্ঠ কণ্ঠ তালু ইত্যাদি Vocal instruments-গুলোর মধ্যেই নেই, আছে তা তার অন্তরে, যেখানে মানুষ বচনশীলতায় মুখর সেখানে নেই, আছে তা যেখানে সে আত্মোপলব্ধিতে প্রখর। মন্ত্র হয়ে ওঠে কেবল বাক্য, যখন সেই মন্ত্রের সঙ্গে মানুষের আত্মার কোনই সম্বন্ধ থাকে না। বাক্যের জোর তখনই, যখন তা হ'য়ে ওঠে মন্ত্র, মন্ত্রের গুণ তখনই যখন তা সেই মানুষের আত্মার সত্যে ও শক্তিতে অভিষিক্ত।

কিন্তু সাহিত্য-সেবায় তুমি জীবন উৎসর্গ করবে জেনে সুখী হলেও আমি তোমার একটা প্রশ্ন শুনে একটু দমে গিয়েছি—সাহিত্য-জগতে তোমার সাফল্য সম্বন্ধে। তুমি যে জিজ্ঞেস করেছ, আজ যে বাঙলা দেশের সাহিত্য-সভায় দুটো দল গড়ে' উঠল, যার এক দলকে পুরাতন ও অন্য দলকে নূতন-পন্থী নামে অভিহিত করা হয়ে থাকে এই দু' পন্থীর মধ্যে কোন্ পন্থা পান্থজনের শ্রেয়? এ প্রশ্নে তোমার কৃতার্থতা সম্বন্ধে আমি স্বভাবতই একটু দমে' গিয়েছি এই জন্যে যে, ও-প্রশ্নের অর্থই হচ্ছে সন্দেহ ও সংশয়। আর সন্দেহ ও সংশয়ের মানে হচ্ছে নিজের অন্তর থেকে সেই বিষয়ে একটা কোন স্পষ্ট তাগিদ না আসা। অন্তরের এই তাগিদই হচ্ছে মানুষের সত্য; সুতরাং সেই পন্থাই তার পন্থা। মানুষ যতক্ষণ না এই রকম তাগিদ তার অন্তর থেকে পায় ততক্ষণই তার প্রশ্ন—এটা করি না ওটা

ধরি? এ রকম দু' নৌকোয় পা রাখলে আর যাই হোক, নৌকো চলে না। কিন্তু যা হোক এ সম্বন্ধে তোমায় আমি একটা ব্যক্তিগত মত দিতে পারি। আমার দৃঢ় ধারণা যে বাঙলা-সাহিত্যে আজ আমরা যে পন্থাই অবলম্বন করি না কেন, আজ আমরা সেখানে বৌদ্ধ দোঁহার সুর ভাঁজতে গেলে যতখানি ঠকব, বৈষ্ণব পদাবলীর তান সাধতে গেলেও ঠিক ততখানিই ঠকব। কেননা আজ আমরা বৌদ্ধও নই বৈষ্ণবও নই—অর্থাৎ অন্তরে।

আসলে পুরাতন পন্থা ও নূতন পন্থা কতকটা সত্যি হলেও ও-সম্বন্ধে তর্কটার অনেকখানিই বাজে। বাঙলা-সাহিত্য সম্বন্ধে আসল খাঁটি কথা যেটা সেটা হচ্ছে এই যে, তা প্রথমে বাঙলা হওয়া চাই, দ্বিতীয়ত তা সাহিত্য হওয়া চাই। এই হলেই আর কোন সংজ্ঞাই সেটাকে বাঙলা-সাহিত্যের ফলাহারে আপাংক্তেয় করে' রাখতে পারবে না।

এত বড় একটা কথার মুখে তর্কের খাতিরে তুমি জিজ্ঞেস করতে পার যে, যদি কোন বাঙালী ঔপন্যাসিক কামস্কাট্‌কাবাসী এক জোড়া যুবক-যুবতীর প্রণয়-কাহিনী বর্ণনা করে' একখানা উপন্যাস লেখেন তবে সে গ্রন্থকে বাঙলা-সাহিত্যের জাতে তুলে নিতে হবে কি না? তা বাঙলা-সাহিত্যে স্থায়ী আসন গেড়ে বসবে না কি?—নিশ্চয় তাকে জাতে তুলে নিতে হবে। সাহিত্য-বৃক্ষের নানা শাখা যেমন কাব্য উপন্যাস ইতিহাস ইত্যাদি। এখন যদি বাঙালী-ঐতিহাসিক বাঙলা-ভাষায় একখানি মেক্সিকোর ইতিহাস লেখেন তবে তা বাঙলা-সাহিত্যের সম্পদ হবে কি না? মেক্সিকোর ইতিহাস যদি বাঙলা-সাহিত্যের সম্পদ বৃদ্ধি করে তবে কামস্কাট্‌কার প্রণয়-

কাহিনীই বা কেন করবে না? বাঙলা-সাহিত্যে স্থায়ী আসনের কথা, সেটা নির্ভর করবে তার দোষ গুণের উপরে—তা সাহিত্যের খাঁটি জিনিস, না মেকি মাল—তার উপরে।

এই ধর না কেন, কৃত্তিবাস ও কাশীরামদাস যেমন রামায়ণ মহাভারতের গল্প নিয়ে বাঙলা রামায়ণ মহাভারত রচনা করলেন তেমনি যদি কোন কবি ইলিয়ড ও অডেসির গল্প নিয়ে বাঙলা মহাকাব্য রচনা করেন, তুমি কি মনে কর তাহলে তা বাঙলা-সাহিত্যে ফেলা হ'য়ে থাকবে। বাঙালী-মনের এমন সংকীর্ণতা হবে না বলে' আমাদের সবারই প্রাণপণে আশা করা উচিত। তা যদি হয় তবে ইংরেজি-সাহিত্যে শেক্সপিয়ারের হ্যামলেট, রোমিও-জুলিয়েত, ওথেলো ইত্যাদি নাকচ, বায়রনের ডনজুয়ান, চাইল্ড-হারল্ড ইত্যাদি কাব্যগুলো নাকচ—ফরাসী-সাহিত্যেরও ঐ রকম অবস্থা দাঁড়াবে। তোমার সূত্র অনুসারে দেখতে পাচ্ছ জগতের সাহিত্য-ক্ষেত্রে কি রকম একটা হুলুস্থুল বেধে যাবে। এর উত্তরে যদি বল যে, অন্য দেশের সঙ্গে বাঙলা দেশের তুলনা! বাঙলা দেশ গড়ে' উঠেছে divine dispensation-এ। তবে অবশ্য নিরুত্তর হয়ে থাকা ছাড়া আর অন্য উপায় নেই। তবে এইখানে তোমায় স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি যে—

"এর চেয়ে হ'তেম যদি আরব বেদুইন
চরণ-তলে বিশাল মরু দিগন্তে বিলীন!
* * * *
থাকিতে নারি ক্ষুদ্র কোলে আম্রবন ছায়ে"

এ মনের ভাব মানুষের একটা চিরন্তন ভাব। "আম্রবন ছায়ে"র "ক্ষুদ্র কোণ" যতই গভীর কোণ হোক না কেন যতই মধুর কোণ

হোক না কেন, সেই খানেই মানুষের মন চিরকাল আঁটবে না, আঁটবে না। মানুষের জীবন-তারে গুণ গুণ করে একটা সুর চিরদিন, গুঞ্জিত হচ্ছে যদি কান পাততে জান তবে কান পেতে শোন, সে সুর হচ্ছে ঐ—

"এর চেয়ে হ'তেম যদি আরব বেদুইন
চরণ-তলে বিশাল মরু দিগন্তে বিলীন।"

এই সুর যে থামাতে চায় সে বৃহৎকেই থামাতে চায়, মহৎকেই অস্বীকার করতে চায়—এ যেন সান্ধ্য-আকাশের একটা মাত্র তারার পানে চেয়ে সমস্ত আকাশটাকেই ভুলে যাওয়া—সমস্ত আকাশটাকেই অস্বীকার করা।

সে যা হোক আমাদের সাহিত্যে নূতন ও পুরাতন এই শুক-শারীর দ্বন্দ্ব সম্বন্ধে আমার যা মনে হয় তা তোমায় স্পষ্ট করে' বলছি।

প্রথমে দু'দলের দু'জনা চরম পন্থীকে নেওয়া যাক। একজন বলছেন—আমাদের অতীতের অনুকরণ কর। আর একজন বলছেন—ইয়োরোপের অনুকরণ কর। আমার মনে হয় এ দু'জনের কেউই বর্ত্তমানে বাঙলা-সাহিত্যে কোন স্থায়ী সম্পদ দিতে পারবেন না। কেননা অনুকরণ কথাটার অর্থ হচ্ছে মানুষ যা নয় তারই খেলা করা—যে ভঙ্গীটা আত্মার নয় সেই ভঙ্গীটা তার মনের ভিতরে কল্পনা করে' তাই কালি কলমের সাহায্যে কাগজের উপরে আঁকা। কিন্তু সৎ-সাহিত্য, স্থায়ী-সাহিত্য হচ্ছে তাই যাতে ফুটেছে আত্মার চেহারা। কেননা এক আত্মাই হচ্ছে সৎ—আত্মাই হচ্ছে অজর অমর অক্ষয়, কাল তাকে ধ্বংস করতে পারে না, আগুন তাকে পোড়াতে পারে না। এ হচ্ছে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণের কথা—যাঁকে আমরা পূর্ণ অবতার বলে মানি।

আসলে যে অতীতের ভিতর দিয়ে আমরা চলে' এসেছি সে অতীতকে আজ আমরা তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিতে পারব না, আর আজ যে বর্ত্তমানটা আমাদের সামনে এসে পড়েছে সেটাকে আমরা থুড়ি দিয়ে পাশ কাটিয়ে চলতে পারব না। আর এতে অপমান বোধ করবারও কোন প্রয়োজন নেই বা এতে প্রাচীন ঋষিদের গৌরব ক্ষুণ্ণ হ'ল কল্পনা করে' চোখের জল ফেলবারও কোন কারণ নেই।

আমাদের অতীতকে যে আমরা খুলতে পারব না আর আমাদের বর্ত্তমানকে যে আমরা ভুলতে পারব না—ইচ্ছা করলেও নয়—এটা বিশেষ করে প্রমাণিত হয়েছে আমাদেরি সাহিত্য-সাধারণ-তন্ত্রের দু'জন শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকের জীবন দিয়ে। একজন হচ্ছেন মাইকেল মধুসূদন দত্ত আর একজন হচ্ছেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

তুমি মাইকেলের জীবনী জান। ইয়োরোপীয় শিক্ষা দীক্ষা এদেশে আমদানী হবার পর বিলিতি সভ্যতার ঢেউয়ে মধুসূদন যেমন নাকানি-চুবোনি খেয়ে ছিলেন বাঙলা দেশের কিম্বা সমস্ত ভারতবর্ষের আর কেউ তেমন খান নি। তাঁর আহার বিহার পোষাক পরিচ্ছদ ধর্ম্ম কর্ম্ম সব ছিল বিলিতি। কিন্তু তাঁর কলম থেকে স্থায়ী যা বেরুল তা হচ্ছে "মেঘনাদ-বধ"। আর এই "মেঘনাদ-বধ" কেউ যদি ইংরাজিতে অনুবাদ করে' বিলেতে ছাপান তবে তা পড়ে' এ কথা কেউ বলবে না যে তা একজন ইংরেজ কবির রচনা। মাইকেলের সার্ট-ওয়েষ্টকোট ফুঁড়ে যে আত্মা বেরিয়েছিল তা আর যাই হোক ইংলিশ-ম্যানের আত্মা নয়।

অন্যদিকে আবার আছেন রবীন্দ্রনাথ। ছেলেবেলায় তাঁর যা ইংরেজি শিক্ষা হয়েছিল সেটা চাটনি হিসেবে। এ-দেশে ত তিনি

ইংরেজি শিক্ষার "পিল" বরদাস্ত করতে পারলেনই না, বিলেতে গিয়েও যে তিনি সে শিক্ষাকে মটন চপের মতো কাঁটা চামচের সাহায্যে নির্ব্বিবাদে উদরস্ত করতে পেরেছিলেন তা অন্তত তাঁর "জীবন স্মৃতি" পড়ে' মনে হয় না। তবুও আজ যদি কেউ তাঁর "গীতাঞ্জলি" মৈথিলি ভাষায় রূপান্তরিত করে তবে সেটা বিদ্যাপতির রচনা বলে' কেউ ভুল করতেন না নিশ্চয়।

রবীন্দ্রনাথ যে একজন বড় কবি এ কথা তুমি মান। তাঁর প্রতিভা অমানুষী এটাও তুমি স্বীকার কর। এই রবীন্দ্রনাথই একদিন বৈষ্ণব কবিতার রূপে গুণে মুগ্ধ হ'য়ে সেই সুর আপনার হৃদয়-তন্ত্রীতে বাজীয়ে তোলবার চেষ্টা করেছিলেন। তারই ফল হচ্ছে "ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী"। এই "ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী" সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বেশি বয়েসে যে মত প্রকাশ করেছেন তা তোমাকে এখানে শুনিয়ে দিচ্ছি। তিনি তাঁর "জীবন-স্মৃতি" তে লিখেছেন, "ভানুসিংহ যিনিই হৌন তাঁহার লেখা যদি বর্ত্তমানে আমার হাতে পড়িত তবে আমি নিশ্চয় ঠকিতাম না একথা আমি জোর করিয়া বলিতে পারি। * * * *। ভানুসিংহের কবিতা একটু বাজাইয়া বা কসিয়া দেখিলেই তাহার মেকি বাহির হইয়া পড়ে। তাহাতে আমাদের দিশি নহবতের প্রাণগলানো ঢালা সুর নাই, তাহা আজকালকার সস্তা অর্গেনের বিলাতি টুং টাং মাত্র।" এই কথা বলে রবীন্দ্রনাথ যে নিজের রচনা সম্বন্ধে কেবল বিনয়ই প্রকাশ করেছেন তা মনে করবার কোন কারণ নেই। রাধাকৃষ্ণের গানে আজ আমরা "দিশি নহবতের প্রাণগলানো ঢালা সুর" দিতে পারি নে, কারণ এ যুগের আমরা রাধাকৃষ্ণকে ঠিক তেমনি সত্য করে'

পেতে পারিনে, যেমন করে' সে যুগের তাঁরা পেতেন। এই দেখছ না আজকাল আমরা রাধাকৃষ্ণের লম্বা-চওড়া আধ্যাত্মিক বা বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দিতে সুরু করেছি। আর এইটাই প্রমাণ যে আজকার আমাদের রাধাকৃষ্ণের প্রতি প্রেম বা ভক্তির জমাখরচের ফাজিল দাঁড়িয়েছে। আসলে ভক্তির চাইতে আমাদের জ্ঞানের দিকটা বেড়েই চলেছে। তাই আজ গাঁয়ের যমুনার কুলুকুলু রবই আমাদের দু' কান জুড়ে বসে' নেই, আজ ধরণীর সপ্তসিন্ধুর কলকল ধ্বনিতে আমাদের চিত্ত ভরে' উঠেছে। ভক্তির দোষ সংকীর্ণতা—জ্ঞানের গুণ উদারতা। ভক্তির, সে হচ্ছে কূপ; জ্ঞানের সে হচ্ছে বারিধি। ভক্তির কূপ বলেই হয়ত তা শান্ত ও শীতল, কিন্তু শান্ত ও শীতলতাকে বড় করে বিশালতাকে কে অস্বীকার করবে?

এইখানে তুমি নিশ্চয় তর্ক তুলবে। তুমি বলবে যে রবীন্দ্রনাথের ছেলে বয়েসের কাঁচা রচনায় পাকা রঙের ও রসের আশা করা অন্যায়। এবং সেই আশা করে' এবং তাই না পেয়ে তারই উপরে সমস্ত বাঙালী কবির, তথা সমস্ত বাঙালী জাতির, mental Psychology-র ব্যাখ্যা দাঁড় করান কেবল তর্কে জয়লাভ করবার জন্যেই। তুমি হয়ত বলবে যে রবীন্দ্রনাথ যদি ঐ পথ প্রাণপণে আঁকড়ে থাকতেন তবে হাত পাকবার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর কলমের মুখ থেকে এমনি সব পদাবলী ফুটে বেরুত যা "খেয়া"র সুর বা "গীতাঞ্জলি"র গানকে ছাড়িয়ে উঠত। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা গোপবালাদের মতো যে যমুনা-পুলিনের পথ ধরে' চলল না এইটেই মস্ত প্রমাণ যে রবীন্দ্রনাথের তা সত্য নয়। কেবল রবীন্দ্রনাথই কেন?—নবীনচন্দ্র, হেমচন্দ্র, বিহারীলাল থেকে আরম্ভ করে' সত্যেন দত্ত করুণানিধান

পর্য্যন্ত কারো কবি-আত্মাই যমুনা-পুলিনে কদম্ব-তরু ছায়ায় কলম নিয়ে বসে' গেল না। বসবে কি? যমুনা যে আজ শুকিয়ে উঠেছে—আর কদম্বের শাখা প্রশাখা দিয়ে হয়ত মালগাড়ীর "ওয়াগন" তৈরী হচ্ছে। তুমি কি মনে কর যে বাঙলার কবিরা সব যোট বেঁধে জোর করে' বাঙালীর শ্রেষ্ঠ ও গভীরতর সত্যটাকে অস্বীকার করে' আসছেন? আমি কিন্তু তা মনে করি নে।

মানুষের মধ্যে এক কবির জীবনেই কবি-আত্মার সঙ্গে তার বুদ্ধির সংগ্রাম সম্ভব নয়। তা যদি সম্ভব হয় তবে কবি অ-কবিই হয়ে উঠতে পারেন, সু-কবি হন না। যা হোক মধুসূদন "ব্রজাঙ্গনা কাব্য" লিখেছেন। কিন্তু শোন "ব্রজাঙ্গনা"য় তিনি লিখেছেন—

নাচিছে কদম্ব-মূলে বাজায়ে মুরলী রে
রাধিকা-রমণ।
চল সখি! ত্বরা করি দেখি গে প্রাণের হরি
ব্রজের রতন।

চাতকী আমি স্বজনি! শুনি জলধর-ধ্বনি
কেমনে ধৈরজ ধরি থাকি লো এখন?
যাক্ মান, যাক কুল, মন-তরী পাবে কূল,
চল, ভাসি প্রেম-নীরে ভেবে ও-চরণ!

কিন্তু—

কে তুমি, শ্যামেরে ডাক, রাধা যথা ডাকে—
হাহাকার রবে?

কে তুমি, কোন্ যুবতী, ডাকে এ বিরলে, সতি !
অনাথা রাধিকা যথা ডাকে গো মাধবে ?
অভয়-হৃদয়ে তুমি কহ আসি মোরে—
কে না জানে বাঁধা এ জগতে শ্যাম-প্রেম-ডোরে ?

কিম্বা—

কোথা রে রাখাল-চূড়ামণি ?
গোকুলের গাভীকুল দেখ, সখি, শোকাকুল,
না শুনে সে মুরলীর ধ্বনি।
ধীরে ধীরে গোষ্ঠে সবে পশিছে নীরব,
আইল গো-ধূলি, কোথায় রহিল মাধব ?

কিন্তু আবার এর পরেই "বীরাঙ্গনা-কাব্য" থেকে শোন—

এ কি কথা শুনি আজি মন্থরার মুখে
রঘুরাজ ? কিন্তু দাসী নীচ-কুলোদ্ভবা ;
*সত্য-মিথ্যা-জ্ঞান তার কভু না সম্ভবে।
কহ তুমি,—কেন আজি পুরবাসী যত
আনন্দ-সলিলে মগ্ন ? ছড়াইছে কেহ
ফুল-রাশি রাজপথে ; কেহ বা গাঁথিছে
মুকুল—কুসুম—ফল—পল্লবের মালা
সাজাইতে গৃহদ্বারে,—মহোৎসব যেন ?
কেন বা উড়িছে ধ্বজ প্রতি গৃহচূড়ে ?
কেন পদাতিক, হয়, গজ, রথ, রথী
বাহিরিছে রণবেশে ? কেন বা বাজিছে

রণবাদ্য ? কেন আজি পুরনারী-ব্রজ
মুহুর্মুহুঃ হুলাহুলি দিতেছে চৌদিকে ?
কেন বা নাচিছে নট ; গাইছে গায়কী ?
কেন এত বীণাধ্বনি ?

আর বেশি শোনাবার দরকার নেই। একদিকে "ব্রজাঙ্গনা" আর একদিকে "বীরাঙ্গনা"। এ দুয়ের সুরে কোন প্রভেদ অনুভব করতে পারো ? কোন প্রভেদ দেখতে পাও ? এ দুই সুরে ঠিক সেই প্রভেদ, যে প্রভেদ মিথ্যা কথায় ও সত্যের বাণীতে। আসলে মধুসূদন যে ব্রজের গান গেয়েছেন সে গানে সুরও জমে নি আর তালও কেটেছে। তাতে আমাদের "দিশি নহবতের প্রাণ-গলানো ঢালা সুর" ফোটে নি। "ব্রজাঙ্গনা-কাব্য" বাস্তবিক পক্ষে ব্রজাঙ্গনাবধ কাব্য হয়ে উঠেছে।

আসলে আমাদের সাহিত্য সৎ হয়ে উঠবে সেইখানে, যেখানে আমরা সত্য। অতীতের বীজ আমাদের ধমনীতে ধমনীতে রক্তের সঙ্গে জড়িয়ে আছেই, আর আজ আমাদের বাহিরে যে আলোক যে বাতাস রয়েছে, সেই আলোক সেই বাতাসে সেই বীজ যে আকারে ফুটে বেরুবে সেইটেই হবে আমাদের আসল সত্য। এই আজকার আলোকের পাত যদি আমরা আমাদের চোখে পড়তে না দিই, আজকার বাতাস যদি আমরা আমাদের নাসারন্ধ্রে প্রবেশ করতে না দিই তবে আমাদের রক্তে সেই অতীতের বীজ পচে' উঠে আমাদের শরীর মনকেই দূষিত করবে, তাতে করে' সত্যই বল আর সমাজই বল দুয়েরই মরণের পথ ফলাও হ'তে থাকবে। ফলে আমাদের জাতীয় জীবনের সনাতনত্ব অর্থাৎ বৃদ্ধত্বই পাকা হয়ে উঠবে, যৌবন

তাকে কোন দিনই আক্রমণ করতে পারবে না। এটা অনেকের পক্ষে আরামের অবস্থা হলেও সকলের পক্ষে মঙ্গলের কথা নয়।

মানুষ চলতে চলতে তার আপনার পরিচয় লাভ করে। মানুষের সাহিত্য হচ্ছে তার মনের চলার নিরিখ। ওই মনের চলা বন্ধ করবার ক্ষমতা কারোই নেই, কোন শাস্ত্রের পাতেও নেই, কোন অস্ত্রের হাতেও নেই। কেননা মানুষের চলাই হচ্ছে তার প্রথম সত্য। কারণ চলারই অর্থ হচ্ছে জীবনকে পাওয়া। আর এ সত্য মানুষের নিজের গড়া নয়—এ সত্য ভগবানের। এই জন্যে হাজার শাস্ত্রও আজ আমাদের বেঁধে রাখতে পারছে না—লক্ষ্য অস্ত্রও পারবে না।

"অতীত" যতই উৎকৃষ্ট, যতই মহান, যতই যা-কিছু হোক না কেন তার একটা মস্ত অসুবিধা এই যে, তা "বর্ত্তমান" নয়। আর "বর্ত্তমানের" একটা মস্ত সুবিধা এই যে, তা "ভবিষ্যতকে" গড়ে তুলতে পারে। "বর্ত্তমানের" এই সুবিধাকে আঁকড়ে ধরে' যদি আজ আমরা কাজে না লাগাই তবে হয়ত আবার আর একদিন আসবে যখন আবার "পাত্রাধার তৈল কিম্বা তৈলাধার পাত্র" এ প্রশ্নের মীমাংসা করবার জন্যে আমাদের তর্ক করতে বসে' যেতে হবে। বর্ত্তমান যে অতীতকে ফিরিয়ে আনতে পারে না, ভবিষ্যতই কে গড়ে' তুলতে পারে এর জন্যে দোষী কাল। কাল জিনিসটার পিছনে ফেলে-আসা জিনিসের মধ্যে কিছুমাত্র মায়া নেই, তার সমস্ত অনুরাগ অনাগত যে তার জন্যে। মানুষের জগতের এই সব নিয়মকে যত দিন না এক নতুন বিশ্বামিত্র এসে উল্টে দিতে পারছেন ততদিন আমাদের সাহিত্যেও এই সব নিয়মের ব্যতিক্রম কেউ করতে পারবে না। ব্যষ্টির জীবনে যাই হোক না কেন সমষ্টি জীবনের দিক থেকে

এই কালের প্রভাবকে আমরা জানি বলেই 'কাল-মাহাত্ম্য' 'যুগ-ধর্ম্ম' ইত্যাদি কথাগুলো আমরা মানি।

তুমি হয়ত এখানে বলে' বসবে যে কালকেই কি বড় করে তুলতে হবে? মানুষের will বলে কি কোন পদার্থই নেই, পুরুষকার বলে' কি কোন বস্তুই নেই? কালকে পরম করে' দেখাও যা, দৈবকে চরম করে' মানাও তাই। আর খেতে শুতে উঠতে বসতে যেতে দৈবকে মেনে মেনেই ত এ জাতটা গেছে। জীবনকুমার, তুমি ভারতবর্ষের ইতিহাস ভুল পাঠ করেছ। দৈবকে মেনে মেনে এ জাতটা যায় নি, এ জাতটা গিয়েছে পুরুষকারকে না মেনে মেনে। তুমি নিশ্চয় বলবে যে আমি হেঁয়ালি আওড়াচ্ছি। কিন্তু তা নয়। আর ও-কথার তাৎপর্য্য হচ্ছে এই যে, দৈবও সত্য, পুরুষকারও সত্য। কেন না ভগবানও আছেন আর মানুষও আছে। কেবল দৈবকে মেনে মানুষ হয়ে ওঠে জড়, আর খালি পুরুষকারকে মেনে মানুষ হয়ে ওঠে দানব। তাই বড় মঙ্গল সেইখানে যেখানে মানুষ ভগবানের সঙ্গে মিলেছে, মঙ্গলে জয় ও জয়ে মঙ্গল সেইখানে, যেখানে মানুষের পুরুষকারের দ্বারা দৈবই সার্থক হয়ে উঠছে, যেখানে ভগবানের গুপ্ত-বাণীকে মানুষ আপনার মনের ইচ্ছা করে তুলতে পেরেছে। ওইখানেই মানুষের পরাজয় নেই, তার জয়ে অমঙ্গল নেই। তুমি জিজ্ঞেস করতে পার যে সবার পক্ষে ভগবানের বাণী পাওয়া কি সম্ভব? তা সম্ভব নয় বলেই আমাদের সব সময় পুরুষকারকে জাগিয়ে রাখতে হবে, যাতে করে আমাদের সে পুরুষকার আমাদের অজ্ঞাতসারেও ভগবানের দিকে আকৃষ্ট হতে একটা সুযোগ পায়।

কিন্তু কোথায় বৈষ্ণবপদাবলী আর কোথায় পুরুষকার। হয়ত আরও কিছুক্ষণ কলম চালালে তার মুখে ভাষাতত্ত্ব, জীবতত্ত্ব, নেহাৎ পক্ষে প্রত্নতত্ত্ব কি ঐ রকমের একটা কিছু এসে যাবে। কাজেই আজ এই খানেই কসে' দাঁড়ি টানলুম। ইতি

তোমার সেকালের

মৃত্যুঞ্জয়।

মুক্তির ইতিহাস।

—:০:—

সৃষ্টির কাজ প্রায় শেষ হয়ে যখন ছুটির ঘণ্টা বাজে বলে', হেনকালে ব্রহ্মার মাথায় একটা ভাবোদয় হল।

ভাণ্ডারীকে ডেকে বল্‌লেন, "ওহে ভাণ্ডারী, আমার কারখানা ঘরে কিছু কিছু পঞ্চভূতের জোগাড় করে আন, আর একটা নতুন প্রাণী সৃষ্টি করব।"

ভাণ্ডারী হাত জোড় করে বল্‌লে, "পিতামহ, আপনি যখন উৎসাহ করে' হাতি গড়লেন, তিমি গড়লেন, অজগর সর্প গড়লেন, সিংহ ব্যাঘ্র গড়লেন, তখন হিসাবের দিকে আদৌ খেয়াল করলেন না। যতগুলো ভারী আর কড়া জাতের ভূত ছিল সব প্রায় নিকাশ হয়ে এল। ক্ষিতি অপ্ তেজ তলায় এসে ঠেকেচে। থাক্‌বার মধ্যে আছে মরুৎ-ব্যোম, তা' সে যত চাই।"

চতুর্ম্মুখ কিছুক্ষণ ধরে চার জোড়া গোঁফে তা' দিয়ে বল্‌লেন, "আচ্ছা ভাল, ভাণ্ডারে যা আছে তাই নিয়ে এস, দেখা যাক্!"

এবারে প্রাণীটিকে গড়বার বেলা ব্রহ্মা ক্ষিতি অপ্ তেজটাকে খুব হাতে রেখে খরচ করলেন। তাকে না দিলেন শিং, না দিলেন নখ, আর দাঁত যা দিলেন তা'তে চিবোনো চলে, কামড়ানো চলে না। তেজের ভাণ্ড থেকে কিছু খরচ করলেন বটে, তাতে প্রাণীটা যুদ্ধক্ষেত্রের কোনো কোনো কাজে লাগ্‌বার মত হল, কিন্তু তার লড়াইয়ের সখ

রইল না। এই প্রাণীটি হচ্চে ঘোড়া। এ ডিম পাড়ে না তবু বাজারে তার ডিম নিয়ে একটা গুজব আছে, তাই এ'কে দ্বিজ বলা চলে।

আর যাইহোক্, সৃষ্টিকর্ত্তা এর গড়নের মধ্যে মরুৎ আর ব্যোম একেবারে ঠেসে দিলেন। ফল হল এই যে, এর মনটা প্রায় ষোলো আনা গেল মুক্তির দিকে। এ হাওয়ার আগে ছুটতে চায়, অসীম আকাশকে পেরিয়ে যাবে বলে পণ করে বসে। অন্য সকল প্রাণী, কারণ উপস্থিত হলে, দৌড়য়; এ দৌড়য় বিনা কারণে; যেন তার নিজেই নিজের কাছ থেকে পালিয়ে যাবার একান্ত সখ। কিছু কাড়তে চায় না, কাউকে মারতে চায় না, কেবলি পালাতে চায়। পালাতে পালাতে একেবারে বুঁদ হয়ে যাবে, ঝিম্ হয়ে যাবে, ভোঁ হয়ে যাবে, তার পরে না হয়ে যাবে, এই তার মৎলব। জ্ঞানীরা বলেন, ধাতের মধ্যে মরুৎব্যোম যখন ক্ষিতি অপ্ তেজকে সম্পূর্ণ ছাড়িয়ে ওঠে তখন এট রকমই ঘটে।

ব্রহ্মা বড় খুসি হলেন। বাসার জন্যে তিনি অন্য জন্তুর কাউকে দিলেন বন, কাউকে দিলেন গুহা, কিন্তু এর দৌড় দেখ্‌তে ভাল বাসেন বলে এ'কে দিলেন খোলা মাঠ।

মাঠের ধারে থাকে মানুষ। কাড়াকুড়ি করে সে যা-কিছু জমায় সমস্তই মস্ত বোঝা হয়ে ওঠে। তাই যখন মাঠের মধ্যে ঘোড়াটাকে ছুটতে দেখে, মনে মনে ভাবে এটাকে কোনগতিকে বাঁধতে পারলে আমাদের হাটকরার বড় সুবিধে।

ফাঁস লাগিয়ে ধরলে একদিন ঘোড়াটাকে। তার পিঠে দিলে জিন, মুখে দিলে কাঁটা লাগাম। ঘাড়ে তার লাগায় চাবুক আর কাঁখে মারে জুতোর শেল। তা ছাড়া আছে দলামলা।

মাঠে ছেড়ে রাখ্‌লে হাতছাড়া হবে তাই ঘোড়াটার চারদিকে পাঁচিল তুলে দিলে। বাঘের ছিল বন, তার বনই রইল; সিংহের ছিল গুহা, তার গুহা কেউ কাড়ল না। কিন্তু ঘোড়ার ছিল খোলা-মাঠ, সে এসে ঠেকল আস্তাবলে। প্রাণীটাকে মরুৎব্যোম মুক্তির দিকে অত্যন্ত উস্কে দিলে কিন্তু বন্ধন থেকে বাঁচাতে পারলে না।

অত্যন্ত যখন অসহ্য হল তখন ঘোড়া তার দেয়ালটার পরে লাথি চালাতে লাগল। তার পা যতটা যখম হল দেয়াল ততটা হল না তবু চূণ বালি খসে' দেয়ালের সৌন্দর্য্য নষ্ট হতে লাগ্‌ল।

এতে মানুষের মনে বড় রাগ হল। বল্‌লে, "একেই বলে অকৃতজ্ঞতা। দানাপানি খাওয়াই, মোটা মাইনের সইস আনিয়ে আটপ্রহর ওর পিছনে খাড়া রাখি, তবু মন পাই নে!"

মন পাবার জন্যে সইসগুলো এমনি উঠেপড়ে ডাণ্ডা চালালে যে ওর আর লাথি চল্‌ল না। মানুষ তার পাড়াপড়শিকে ডেকে বল্‌লে, "আমার এই বাহনটির মত এমন ভক্ত বাহন আর নেই।"

তারা তারিফ করে বল্‌লে, "তাইত একেবারে জলের মত ঠাণ্ডা! তোমারই ধর্ম্মের মত ঠাণ্ডা!"

একে ত গোড়া থেকেই ওর উপযুক্ত দাঁত নেই, নখ নেই, শিঙ নেই, তার পরে দেয়ালে এবং তদভাবে শূন্যে লাথি ছোঁড়াও বন্ধ। তাই মনটাকে খোলসা করবার জন্যে আকাশে মাথা তুলে সে চিঁহি চিঁহি করতে লাগল। তাতে মানুষের ঘুম ভেঙে যায় আর পাড়া-পড়শিরাও ভাবে আওয়াজটা ত ঠিক ভক্তি-গদ্‌গদ শোনাচ্চে না।

মুখ বন্ধ করবার অনেক রকম যন্ত্র বেরল। কিন্তু দম বন্ধ না করলে মুখ ত একেবারে বন্ধ হয় না। তাই চাপা আওয়াজ মুমূর্ষুর খাবির মত মাঝে মাঝে বেরতে থাকে।

একদিন সেই আওয়াজ গেল ব্রহ্মার কানে। তিনি ধ্যান ভেঙে একবার পৃথিবীর খোলা মাঠের দিকে তাকালেন। সেখানে ঘোড়ার চিহ্ন নেই।

পিতামহ যমকে ডেকে বল্‌লেন, "নিশ্চয় তোমারি কীর্ত্তি! আমার ঘোড়াটিকে নিয়েচ!"

যম বল্‌লেন, "সৃষ্টিকর্ত্তা, আমাকেই তোমার যত সন্দেহ! একবার মানুষের পাড়ার দিকে তাকিয়ে দেখ!"

ব্রহ্মা দেখেন, অতি ছোট জায়গা, চারদিকে পাঁচিল তোলা; তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে ক্ষীণস্বরে ঘোড়াটি চিঁহি চিঁহি করচে।

হৃদয় তাঁর বিচলিত হল। মানুষকে বল্‌লেন, "আমার এই জীবকে যদি মুক্তি না দাও তবে বাঘের মত ওর নখ দন্ত বানিয়ে দেব, ও তোমার কোনো কাজে লাগ্‌বে না।"

মানুষ বল্‌লে, "ছিছি তাতে হিংস্রতার বড় প্রশ্রয় দেওয়া হবে। কিন্তু যাই বল, পিতামহ, তোমার এই প্রাণীটি মুক্তির যোগ্যই নয়। ওর হিতের জন্যেই অনেক খরচে আস্তাবল বানিয়েচি। খাসা আস্তাবল!"

ব্রহ্মা জেদ করে বল্‌লেন "ওকে ছেড়ে দিতেই হবে।"

মানুষ বল্‌লে, আচ্ছা ছেড়ে দেব। কিন্তু সাত দিনের মেয়াদে, তার পরে যদি বল তোমার মাঠের চেয়ে আমার আস্তাবল ওর পক্ষে ভাল নয় তাহলে নাকে খৎ দিতে রাজি আছি।"

মানুষ করলে কি, ঘোড়াটাকে মাঠে দিলে ছেড়ে; কিন্তু তার সামনের দুটো পায়ে কসে রসি বাঁধল। তখন ঘোড়া এমনি চল্‌তে লাগ্‌ল যে ব্যাঙের চাল তার চেয়ে সুন্দর।

ব্রহ্মা থাকেন সুদূর স্বর্গে; তিনি ঘোড়াটার চাল দেখ্‌তে পান, তার হাঁটুর বাধন দেখ্‌তে পান না। তিনি নিজের কীর্ত্তির এই ভাঁড়ের মত চালচলন দেখে লজ্জায় লাল হয়ে উঠ্‌লেন। বল্‌লেন, "ভুল করেচি ত!"

মানুষ হাত জোড় করে বল্‌লে, "এখন এটাকে নিয়ে করি কি? আপনার ব্রহ্মলোকে যদি মাঠ থাকে ত বরঞ্চ সেই খানে রওনা করে দিই।"

ব্রহ্মা ব্যাকুল হয়ে বল্‌লেন, "যাও, যাও, ফিরে নিয়ে যাও তোমার আস্তাবলে!"

মানুষ বল্‌লে, "আদিদেব, মানুষের পক্ষে এ যে এক বিষম বোঝা!"

ব্রহ্মা বল্‌লেন, "সেই ত মানুষের মনুষ্যত্ব!

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

৺রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী।

—:০:—

(১)

বৈদিক যজ্ঞ সম্বন্ধে সেনেট হলে পঠিত পাঁচটি প্রবন্ধই বোধ হয় ত্রিবেদী মহাশয়ের শেষ রচনা। এর সর্ব্বশেষ প্রবন্ধটি আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দর বেদ ও যজ্ঞের জন্মদাত্রী, তাঁর জন্মভূমির একটি বন্দনা দিয়ে শেষ করেন। এবং আমরা, তাঁর শ্রোতারা সমস্ত স্থানোচিত গাম্ভীর্য্য বিস্মৃত হয়ে' 'বন্দেমাতরম্' ধ্বনিতে সভা ভঙ্গ করি। শুনেছি এই ঘটনাটি আমাদের দেশের দু'একজন যথার্থ পণ্ডিত ব্যক্তিকে ক্ষুব্ধ করেছে। যে ভাব ও যে ভাষা সেনেট হলের ভিতরকে তার বাহিরের দিঘির পার বলে' বিভ্রম জন্মায়, তা বিশ্ব-বিদ্যার আলয়ের উপযুক্ত কি না এ বিষয়ে তাঁদের মনে সন্দেহ উঠেছে। সে সন্দেহের নিরাসন কামনায় কোনও তর্ক তুলছি নে। কিন্তু বিশ্ব-বিদ্যালয়ের উচ্চ আদর্শ খর্ব্ব করুক আর না-ই করুক এই ব্যাপারটি রামেন্দ্র-সুন্দরের সাহিত্য সৃষ্টির একটি মর্ম্ম কথার সঙ্গে আমাদের পরিচয় করিয়ে দেয়।

রামেন্দ্রসুন্দর ছিলেন পণ্ডিত। সে পাণ্ডিত্যের ব্যাপকতা ও গভীরতা কোনও দেশেই সুলভ নয়। আধুনিক য়ুরোপের জ্ঞান বিজ্ঞান এবং প্রাচীন ভারতবর্ষের বেদ ও বেদাঙ্গ—এদু'য়ের সঙ্গে কেবল তার ঘনিষ্ঠ পরিচয় নয়, মনের নাড়ীরও নিগূঢ় যোগ

ছিল। কিন্তু এ পাণ্ডিত্য তাঁর মনকে ভারাক্রান্ত করে নি। এ বিদ্যাকে তিনি অতি সহজ লঘুভাবেই বহন করতেন। কারণ এই জ্ঞান বিজ্ঞান, বেদ বেদাঙ্গ সবই ছিল তাঁর সতেজ ও সবল মনের খাদ্য-পানীয়, সঞ্চিত ধনের বোঝা নয়। এই জন্য তার লেখার কোনও জায়গায় পাণ্ডিত্যের ছাপ ঠেলে ওঠে নি। তাঁর সজীব ও সরস মন পাণ্ডিত্যকে বাহন মাত্র করে' নিজেকেই প্রকাশ করেছে। তাই তাঁর সমস্ত রচনা তাঁর 'সুন্দর হাস্যে' উদ্ভাসিত, তাঁর চিরনবীন 'সুন্দর হৃদয়ের' 'মাধুর্য্য-ধারায় অভিষিক্ত'। তাঁর বৈজ্ঞানিক-নিবন্ধ, দার্শনিক চিন্তা, ভাষাতত্ত্ব, সমাজ বিজ্ঞান সমস্তই পাণ্ডিত্যকে এড়িয়ে সাহিত্য হয়ে' বিকশিত হয়ে' উঠেছে।

কলেজের পাঠ্যাবস্থায় রামেন্দ্রসুন্দরের বিশেষ পাঠ্য ছিল জড়-বিজ্ঞান। এবং তাঁর প্রথমকার প্রবন্ধগুলি প্রায় সবই বৈজ্ঞানিক সন্দর্ভ। আধুনিক বিজ্ঞানের সোনার কাঠির স্পর্শে প্রকৃতির কোন কোন মহলের দরজা খুলেছে, এবং কোন প্রাসাদে রাজ-কন্যারা জেগে উঠছেন, কোথায় বা দৈত্য-দানবের ঘুম ভাঙছে; সেই বিচিত্র কাহিনী যুবক রামেন্দ্রসুন্দর বাঙালী পাঠকদের উপহার দিয়েছেন। সত্য-নিষ্ঠার কঠোরতায়, বিশ্লেষণের নৈপুণ্যে, রচনার সরসতায় ও কল্পনার বৈচিত্র্যে আচার্য্য হাক্সলির বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধাবলী ছাড়া এ গুলিকে আর কিছুর সঙ্গে তুলনা করা চলে না। আধুনিক বিজ্ঞানের জ্ঞান-কাণ্ড এবং তার আচার্য্যেরা ত্রিবেদী রামেন্দ্রসুন্দরের মনের শ্রদ্ধা ও প্রীতি কতটা অধিকার করেছিল হেল্‌মহোৎসের মৃত্যুর পর তাঁর জীবনী-প্রবন্ধে তিনি তার পরিচয় রেখে গেছেন। এই বিজ্ঞান চর্চ্চা ও বিজ্ঞান প্রীতি রামেন্দ্রসুন্দরের সমস্ত চিন্তা ও রচনাকে অনন্য

সাধারণ যুক্তির দৃঢ়তা ও স্বচ্ছতা দান করেছে। মতামতের সমর্থনে ও সমালোচনায় তাঁকে সমস্ত রকম অনুদরতা ও আতিশয্যের স্পর্শ থেকে মুক্ত রেখেছে।

আধুনিক প্রাণ-বিজ্ঞান রামেন্দ্রসুন্দরের অতি প্রিয় আলোচ্য বিষয় ছিল। ডারুইন থেকে আরম্ভ করে' বাইস্‌ম্যান, ডিভ্রিস্, ও নব-মেণ্ডেলীয় পণ্ডিতেরা প্রাণের যে নিগূঢ় তত্ত্ব প্রচার করেছেন রামেন্দ্রসুন্দরের ভাবুক মন তাতে গভীরভাবে সাড়া দিয়েছে। তাঁর সমাজ ও ধর্ম্মতত্ত্বের আলোচনা এই নবীন জীববিদ্যার প্রভাবে পরিপূর্ণ। প্রাণের বিকাশ ও বিকারের তত্ত্বের আলোতে মানুষের সমাজ ও সভ্যতার উত্থান পতনের অন্ধকার পথ কতটা আলোকিত হয় তিনি পরম কৌতূহলের সঙ্গে নানা প্রসঙ্গে সেটা পরীক্ষা করে' দেখেছেন। এই আলোচনাগুলি রামেন্দ্রসুন্দরের বিজ্ঞান ও দার্শনিক চিন্তার মধ্যে সেতুর মতন। প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের আলোকোজ্জ্বল-কূয়াশাহীন দ্বীপ থেকে যাত্রা আরম্ভ করে' তিনি এইখানে মানুষের অদৃষ্ট ভবিষ্যতের তমসাবৃত মহাদেশের দিকে পা বাড়িয়েছেন। এ আলোচনাগুলি বিজ্ঞানের মাটিতে শিকড় গেড়ে দর্শনের আকাশে পাতা মেলেছে, এবং সাহিত্যের অমৃতরস এদের অক্ষয় নবীনতা দান করেছে।

অদীর্ঘায়ু জীবনের শেষভাগে ত্রিবেদী রামেন্দ্রসুন্দর এই বিজ্ঞানের জ্ঞান, দার্শনিক-চিন্তা ও সাহিত্যের রস প্রতিভার রসায়নে একত্র মিশিয়ে বাঙলা-সাহিত্যকে এক অপূর্ব্ব সম্পদ দান করে' গেছেন। রিপণ কলেজের অধ্যাপক সম্মিলনীতে অধ্যক্ষ রামেন্দ্রসুন্দর ধারা-বাহিক কয়েকটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। এর অনেকগুলিই 'ভারতবর্ষ'

পত্রিকায় পরে ছাপা হয়েছে। প্রবন্ধগুলির বিষয় ছিল আমাদের নিত্য ঘরকন্নার ব্যবহারিক জগৎ, বিজ্ঞানের কল্পিত প্রাতিভাসিক জগৎ, এবং আধ্যাত্ম জ্ঞানের পারমার্থিক জগতের মধ্যে সম্বন্ধ নির্ণয়। সাধারণ অবৈজ্ঞানিক লোকে শরীর যাত্রা নির্ব্বাহের জন্য জগতের যে মূর্ত্তি কল্পনা করে বা করতে বাধ্য হয়, বৈজ্ঞানিক তাকেই একটু কেটে ছেঁটে, অল্প-বিস্তর মেজে ঘসে' নিজের কাজ আরম্ভ করেন। কেননা সে কাজই হল এই ব্যবহারিক জগতের বস্তু ও ঘটনার, স্থিতি ও গতির ব্যাখ্যা দেওয়া। কিন্তু এই ব্যাখ্যার পথে চলতে চলতে আধুনিক বিজ্ঞান এমন সব তত্ত্বের পরিকল্পনা করতে বাধ্য হয়েছে ও হচ্ছে যে তাদের সমাবেশে জগতের যে মূর্ত্তিটি গড়ে' ওঠে সেটি মোটেই আমাদের পরিচিত ব্যবহারিক জগতের মূর্ত্তি নয়। যে মূলের টীকা আরম্ভ হল, টীকা শেষ হলে দেখা গেল সে মূলই নেই। ফলে ব্যবহারিক জগতের সঙ্গে এই বৈজ্ঞানিক জগতের ঠিক সম্বন্ধটা কি, এবং এই দুই কল্পিত জগতের কোন অংশটা কি অর্থে সত্য, এ সমস্যাটি দাঁড়িয়েছে যেমন কঠিন, তেমনি কৌতূহল-কর। ব্যবহারিক জগতের সঙ্গে পরমার্থিক সত্যের সম্বন্ধ অবশ্য দর্শন-শাস্ত্রের প্রাচীন ও আদিম প্রশ্ন। কিন্তু বর্ত্তমানে বৈজ্ঞানিকের কল্পিত জগতটি মাঝে পড়ে' প্রশ্নটিকে আরও ঘোরাল করে' তুলেছে। অভিজ্ঞ লোকে জানেন, এই সমস্যা বর্ত্তমান পাশ্চাত্য দর্শনের বোধ হয় সর্ব্ব-প্রধান আলোচ্য বিষয়। এবং পশ্চিমের বহু বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক মনীষা এর আলোচনায় নিযুক্ত আছে। কিন্তু আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দরের এই কয়টি বাঙলা প্রবন্ধের চেয়ে এ সমস্যার অধিক সূক্ষ্ম, অধিক গভীর ও অধিক সরস আলোচনা য়ুরোপেরও কোনও

দেশের ভাষা দেখাতে পারবে কিনা সন্দেহ করা চলে। কেননা অধুনিক জড় বিজ্ঞানের সঙ্গে যে নিকট পরিচয়, ভারতীয় ও পাশ্চাত্য দর্শনের চর্চ্চায় যে মার্জ্জিত বুদ্ধি ও ভাবপ্রকাশে সাহিত্যিকের যে শক্তি ও রস রামেন্দ্রসুন্দরে একত্র সমবেত হয়েছে বর্ত্তমান য়ুরোপের সারস্বত-সমাজেও তা সুদুর্লভ। আমাদের দুর্ভাগ্য রামেন্দ্র-সুন্দর এই আলোচনাকে সম্পূর্ণ পরিণত গড়ন দিয়ে যেতে সময় পান নি। এবং বাঙলা ভাষা ও সাহিত্য বিশ্বের জ্ঞান বিজ্ঞানের ভাণ্ডারে একটা দেবার মত দানের গৌরব থেকে বঞ্চিত হয়েছে।

(২)

৺রামেন্দ্রসুন্দরের সব স্মৃতি সভাতেই বক্তারা তাঁর স্বদেশ-প্রীতির কথা তুলেছেন। আমাদের দেশের বর্ত্তমান এখন আমাদের মনে কাঁটার মত বিঁধে রয়েছে। অনুভবের শক্তি যার একেবারে লোপ হয় নি তার পক্ষেই বেশিক্ষণের জন্য দেশকে ভুলে থাকা অসম্ভব। এই বেদনার নিত্য অনুভূতি আমাদের স্বদেশ-প্রীতির প্রথম লক্ষণ। এ ব্যাথা রামেন্দ্রসুন্দরের মনে কত মর্ম্মান্তিক ছিল, তাঁর লেখার সঙ্গে অল্পমাত্রও যার পরিচয় আছে তিনিই তা জানেন।

দেশের যাঁরা কর্ম্মী তাঁদের স্বভাবতই চেষ্টা হবে উপযুক্ত প্রতিষ্ঠান ও অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে হীন বর্ত্তমানকে মহৎ ভবিষ্যতের দিকে নিয়ে যাওয়া। রামেন্দ্রসুন্দর লোকে যাকে কাজের লোক বলে ঠিক তা ছিলেন না। যে রজোগুণের প্রাচুর্য্য মানুষকে ক্ষণমাত্রও অকর্ম্মকৃৎ থাকতে ও কাজ ছাড়া আর কিছুতেই আনন্দ পেতে দেয় না তাঁর প্রকৃতিতে সে রজোগুণের অভাব ছিল। ভাব ও চিন্তার

জগৎ ছাড়া কাজের জগতের চলাফেরা তাঁকে বিশেষ আনন্দ দিত না। কিন্তু রামেন্দ্রসুন্দরের স্বদেশপ্রীতি এক জায়গায় তাঁর এই প্রকৃতিকে জয় করেছিল। বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ-এর কাজে তিনি অক্লান্ত কর্ম্মী ছিলেন। তিনি এর জন্য অকাতরে নিজের সময় ও স্বাস্থ্য, দান করে' গেছেন। মনে হয় এ না হলে তিনি হয়ত জ্ঞান ও চিন্তার রাজ্যে আমাদের আরও অনেক বেশি দিয়ে যেতে পারতেন। কিন্তু স্বদেশের যে ভাষা ও সাহিত্যের বিগ্রহকে তিনি বিশেষ ভাবে পূজা করতেন, তার কাজের আহ্বান রামেন্দ্রসুন্দর কোনও মতেই উপেক্ষা করতে পারেন নাই।

প্রাচীন হিন্দু সভ্যতার উপর শ্রদ্ধা বোধ হয় আধুনিক হিন্দুর স্বদেশপ্রীতির একটা অপরিহার্য্য অঙ্গ নয়। আমাদের দেশে এমন সব স্বদেশহিতৈষী আছেন যাঁদের অন্তরে এই সভ্যতার প্রতি বিন্দু-মাত্রও শ্রদ্ধা ও প্রীতি নেই। তাঁরা যে কথায় বা বক্তৃতায় এই সভ্যতায় গৌরব করেন না এমন নয়। কিন্তু যদি কোনও আলাদীন একরাত্রের মধ্যে ভারতবর্ষের সমস্ত অতীতটাকে মুছে ফেলে ভোরের আলোর সঙ্গে সঙ্গে আধুনিক য়ুরোপকে (প্রকৃতপক্ষে আধুনিক ইংলণ্ডকে কেননা ইংলণ্ডের বাইরের য়ুরোপীয় সভ্যতার সঙ্গে আমাদের তেমন পরিচয় নেই) একবারে গোটা দেশের উপরে বসিয়ে দিয়ে যায় তাতে তাঁরা হর্ষোৎফুল্লই হয়ে উঠবেন। এর অবশ্য এক কারণ—রুচিব প্রভেদ, মানুষের সকল বিষয়েই যখন রুচির তফাৎ রয়েছে, তখন কেবল সভ্যতার বেলাতেই দেশের সকলের রুচি এক হবে এমন আশা করা চলে না। কিন্তু এর নিঃসন্দেহ প্রধান কারণ আমাদের দেশের প্রাচীন সভ্যতার সঙ্গে আমাদের পরিচয়ের একান্ত অভাব। যে

একমাত্র সজীব ও সবল সভ্যতাকে আমরা জানি সে হ'ল আধুনিক য়ুরোপের হালের সভ্যতা। এবং সে সভ্যতা যখন বর্ত্তমানে সাংসারিক হিসাবে অতি প্রবল তখন তাতে যে আমাদের মনকে মুগ্ধ এবং বাসনাকে প্রলুব্ধ করবে এতে আশ্চর্য্য হবার কিছুই নেই।

কিন্তু ত্রিবেদী রামেন্দ্রসুন্দরের দৃষ্টি কেবল হালের য়ুরোপেই একান্ত নিবদ্ধ ছিল না। এ সভ্যতার যা শ্রেষ্ঠ ফল তার আস্বাদ তিনি বিশেষ ভাবেই পেয়েছিলেন। কিন্তু সেই সঙ্গে মানবজাতির প্রাচীন সভ্যতাগুলিরও তাঁর নিকট পরিচয় ছিল। সে পরিচয়ে তিনি জেনেছিলেন মানুষের সভ্যতার বিশালতা ও তার ইতিহাসের বৈচিত্র্য। সেইজন্য চোখের সামনে আছে বলেই বর্ত্তমান তাঁর কাছে অসঙ্গত রকম বড় হয়ে উঠতে পারে নি। প্রাচীন ও নবীন নানা সভ্যতার তুলনার ফলে তিনি প্রাচীন হিন্দু-সভ্যতার প্রতি অশেষ প্রীতিমান ও গভীর শ্রদ্ধাবান হয়েছিলেন। অথচ সে প্রীতিতে কোনও মোহ ছিল না, সে শ্রদ্ধায় কোনও গোঁড়ামি ছিল না। এ হিন্দু-সভ্যতা যে বিশাল মানব-সভ্যতার একটা অংশমাত্র সে কথা তিনি কখনও ভোলেন নি। সেইজন্য ত্রিবেদী রামেন্দ্রসুন্দর নিতান্ত নিঃসঙ্কোচে বৈদিক মতের অনুষ্ঠান ও তার আদর্শের সঙ্গে সৃষ্টির ধর্ম্মের অনুষ্ঠান ও আদর্শের তুলনা করে' এ দুয়ের মধ্যে গভীর মিল দেখিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু এ বিশ্বাসও তাঁর খুব দৃঢ় ছিল যে অভিজ্ঞের বিচারে আমাদের প্রাচীন সভ্যতাকে কোনও সভ্যতার কাছেই মাথা হেঁট করে' দাঁড়াতে হবে না। কেন না তিনি সেই ভারতবর্ষকে জেনেছিলেন যে ভারতবর্ষ বেদ ও উপনিষদ্ সৃষ্টি করেছে, কপিল ও শাক্যমুনিকে জন্ম দিয়েছে, যার কবি মহাভারত রচনা করেছে, যার

ঋষি ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ কোনও বিদ্যাকেই উপেক্ষা করে নাই; যে ভারতবর্ষের ক্ষত্রিয় দিগ্বিজয়ে গৌরব খুঁজেছে, যার রাজপুত্র রাজ্য ত্যাগ করে' প্রব্রজ্যা নিয়েছে। হিন্দুর এই প্রাচীন সভ্যতা রামেন্দ্রসুন্দরকে মুগ্ধ করেছিল, এবং তিনি তাঁর স্বদেশবাসিকে এর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতে ব্যস্ত হয়েছিলেন। তার ফল তাঁর 'ঐতরেয় ব্রাহ্মণ'-এর বাঙলা অনুবাদ, তাঁর 'বিচিত্র প্রসঙ্গ,' তাঁর বৈদিক যজ্ঞের বিবরণ ও ব্যাখ্যা। তিনি বেঁচে থাকলে যে এই কাজেই তাঁর শক্তিকে বিশেষ করে' নিয়োজিত করতেন তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু যে ঋত বা নিয়মের তিনি উপাসক ছিলেন তাতে ব্যবস্থা অন্যরূপ। রামেন্দ্রসুন্দরের অকাল মৃত্যুতে দেশের এই ক্ষতিই বোধ হয় সব চেয়ে গুরুতর। ভাবহীন ও শ্রদ্ধাহীন পাণ্ডিত্যের হাতে ভারতবর্ষের প্রাচীন সভ্যতা কেমন মূর্ত্তি ধারণ করে তা আমরা জানি; এবং রুদ্ধচক্ষু শ্রদ্ধার কাছে তার কি লাঞ্ছনা তাও আমাদের অজ্ঞাত নেই। কিন্তু ভাবুক ও শ্রদ্ধাশীল চক্ষুষ্মান ও পণ্ডিতের মনে ভারতবর্ষের প্রাচীন সভ্যতার কি মূর্ত্তি বিরাজ করে রামেন্দ্রসুন্দর তার পরিচয় আমাদের দিতে আরম্ভ করেছিলেন। কিন্তু প্রস্তাবনাতেই তার যবনিকা পড়েছে, এবং অদূর ভবিষ্যতে তার অপসারণেরও কোনও সম্ভাবনা দেখা যায় না।

১২ই জুলাই, ১৯১৯

শ্রীঅতুলচন্দ্র গুপ্ত।